বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

ষষ্ঠদশ বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল-জুন 1994 | পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায় থাকছে

সুন্দরবনের চালচিত্র

বীজ নিয়ে আন্দোলন

কৃষকরা যা বলছেন

বিষয় পরিবেশ, মতামত পাঠান

ভূমিকম্প, ভূমিকম্প

অশোকনগরে বি এস এফ ক্যাম্প

ডোমজুড়ের আলকাতরা আতঙ্ক

সাবধান, নরপ্ল্যান্ট আসছে

সংবাদ পরিক্রমা

পালক-নীতি, একটি প্রয়াস

আমাদের কথা

কলকাতা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরত্বে একটি সুপার হাইওয়ে তৈরী হওয়ার কথা। দূর থেকে দেখা যায় ধুলোর মেঘ উড়িয়ে মাতালের মত ট্রাকের সারি চলেছে, আধভাঙা খোওয়া আর মাটির রাস্তা মাড়িয়ে। এ দৃশ্য কিন্তু কয়েক মাস বা এক বছরের নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই পুরো প্রকল্পটাই যেন দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। যে কোন ছোট শহর-গঞ্জের রেল স্টেশনে নেমে বাজার এলাকার মধ্যের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে চোখে পড়বে দু পাশে আধ ময়লা দোকান পত্তর, মাছি, ভনভন করছে। রাস্তা আর নর্দমার ফারাক খুঁজে পাওয়া দুস্কর। খাবার জলের খোঁজ করলে যা পাবেন তাতে আঁতকে উঠতে হয়। এ ছবিও কিন্তু এক আধ দিনের নয়। দশ বছর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। অথচ সব কিছুই কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। বাড়ছে বন্ধ কলকারখানার সংখ্যা, বাড়ছে সদর-মফস্বলে কাজ না পাওয়া ছেলে-মেয়ের সংখ্যা, হু হু করেই। এক বন্ধু আক্ষেপ করছিলেন 'সব কিছুই যেন ভেঙে পড়ছে'। কলকাতা-সল্টলেকে আলো জ্বলে, কিন্তু গ্রামেগঞ্জে বিদ্যুত থাকে না লম্বা সময় ধরে। সময়মত অ্যান্টি ভেনম সিরাম না পেয়ে সাপের কামড়ে মানুষ মারা যান এমন কি সংস্কৃতির পীঠস্থান (!) থেকে ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেই। রাস্তা সারান হয় দ্রুত ভেঙে যাবার জন্য। সংযুক্ত নর্দমা ব্যবস্থার কথা আজ বহু জায়গাতেই

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা বা রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ—

(1) অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা—700 089, ফোন—34-7982

(2) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি—22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা—700 091, ফোন—359-0297

একটি আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। 1994 সালের জন্য গ্রাহক হোন। গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক 16 টাকা।
(বিশেষ ক্ষেত্রে বার্ষিক 10 টাকা।)

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

বপ্নের মত শোনাবে। মশা থাকছে, থাকছে ম্যালেরিয়াও। একজন প্রশ্ন করছিলেন, "একটা ছোট গঞ্জ দেখাতে পারেন, বেশ ঝকঝকে তকতকে। নিটোল রাস্তাঘাট, জল বাহিত রোগ নেই, স্কুল থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবকিছু পরিচালনায়ই স্থানীয় মানুষ অংশ নেন উৎসাহ ভরেই"।

আসলে এই ছোট্ট প্রশ্ন আর নানান টুকরো কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমরা হয়ত এগিয়ে যাই আরও এক গুচ্ছ বড় প্রশ্নের দিকে। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে টাকা চাই, তা না হলে গ্রামে-গঞ্জের স্বাস্থ্য ফিরবে কি করে? হ্যাঁ, টাকা দিয়ে উন্নয়ণ তো করাই যায়, তবে তা সুস্থ উন্নয়ণ কি না সেও আরেক প্রশ্ন। উদাহরণ চান? কেন, দ্বিতীয় হুগলি সেতু আর সবার ওপরে মেট্রো রেল। কত সম্পদ গেছে এদের পেছনে? আর এখানেই আসে আরেক প্রশ্ন কোথায় চান উন্নয়ণ—কলকাতায় না পশ্চিমবঙ্গে? কলকাতায় যে পাহাড়ের মত টাকা-পয়সা ঢালা হয় তা দিয়ে গ্রাম বাংলায় হাল ফিরিয়ে দেওয়া যেত কি? সেখানেও আসে প্রশ্ন, আমরা কি অনেক মিনি কলকাতা চাই? আর শুধু টাকা ঢেলে উন্নয়ণের ফল, 'পুকুর চুরি' না কি বলব 'সাগর চুরি'। আর সবশেষ প্রশ্ন আপনার আমার নিস্ক্রিয়তা নিয়ে, সত্যিই কি চারিদিকে সব্বাই জগন্নাথ'?

* * * * *

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বরোদা অফিসে সম্প্রতি হামলা করে একদল দুষ্কৃতকারি। প্রকল্প চালু থাকলে যাদের লাভ সেই কন্ট্রাক্ট—কমিশন লবি, অর্থাৎ মাফিয়া রাজনীতিবিদ—কন্ট্রাক্টর—আমলাচক্র এই আন্দোলনে যে শঙ্কিত এটা তারই প্রমাণ। তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এদের।

সূচীপত্র

আমাদের কথা—1 ☐ "কাকদ্বীপের এক মা"—নাটক নয়, ঘটনা / বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত—3 ☐ বীজ নিয়ে কৃষক আন্দোলন / শুভেন্দু দাশগুপ্ত—8 ☐ নতুন কৃষি প্রযুক্তি: কৃষকদের ভাবনায় / অরূপ রতন মুখোপাধ্যায়—10 ☐ দূষণ সমস্যা শুধু প্রযুক্তিগত নয়, মানবিকও / রবীন মজুমদার—12 ☐ মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প—একটি পর্যালোচনা / তপন চক্রবর্তী—15 ☐ ভূমিকম্প কি ও কেন / ত.চ.—24 ☐ ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ / ত.চ.—25 ☐ চাষের জমিতে বি এস এফ হানা—প্রতিবাদ, প্রতিরোধ / সুবোধ দাস ও শক্তি ভট্টাচার্য—27 ☐ আলকাতরা দূষণ থেকে আমাদের বাঁচান / অলোক চ্যাটার্জী—29 ☐ নরপ্লান্ট আসছে, একটু ভাবুন / অমিতা—31 ☐ কলকাতার ট্রাম—ডেনমার্কবাসীর দুর্ভাবনা / র.চ.—37 ☐ জেলার উন্নয়নে মহাকাশ দপ্তর / র.চ.—38 ☐ প্রতিটি গ্রামে টেলিফোন / র.চ.—38 ☐ পালক নীতি: একটি পত্রিকার নাম / শর্মিষ্ঠা খের—39 ☐

"কাকদ্বীপের এক মা"—নাটক নয়, ঘটনা

দেবী বিশালাক্ষী অন্য কেউ নন। হিন্দু দেবদেবীদের পাড়াতে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। কারণ তিনি আসলে দেবী দুর্গা। তবে দশভুজা নন দেবী বিশালাক্ষী। অষ্ট-ভুজা। তাঁর কল্পিত মূর্তিতে দেখা যায়—তিনি ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠদেশে সমারূঢ়া। একাধিক হস্তে ধারণ করে আছেন অস্ত্র। একটি হস্তে শংখ। অন্য একটিতে চক্র। অবশ্য বরাভয় দিচ্ছেন অন্যতম দক্ষিণ হস্তে। হ্যাঁ স্বামী-প্রদত্ত ত্রিশূলও আছে একটি হস্তে। গ্রাম বাংলার জনপদে দেবী বিশালাক্ষীর বাজার খুব একটা ফেলনা নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন লোকালয়েও তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এই রকম একটি দেবী বিশালাক্ষীর স্থান বা 'থান' ছিল কাকদ্বীপ থানার নেবুতলা মৌজার নাগের মহল গ্রামে। গ্রামের প্রান্তে একটা খাল, পাশে রাস্তা। রাস্তার পাশে বনজঙ্গলে ঘেরা বিশালাক্ষী দেবীর 'থান'। ঘর বলতে কিছু নেই। তবে এককালে ছিল বলে সাক্ষ্য দেয় কিছু পুরাতন ইঁট। 'পুণ্যলোভীর নাই হলো ভিড় শূন্য তোমার অঙ্গনে—জীর্ণ হে তুমি দীর্ন দেবতালয়' গোছের ভাব। কালে-ভদ্রে পূজাদি জুটতো দেবীর। তবে জনশ্রুতি এই যে—যেসব শিশু কথা বলতে পারার যুক্তিযুক্ত সময় উত্তীর্ন হয়ে যাওয়া সত্বেও কথা বলতে পারতো না, দেবী বিশালাক্ষীর থানে পূজা দিলে, তারা সত্বর বাকপটু হয়ে উঠতো। অশেষ কল্যাণ সাধন বটে। তবে দেবীর দক্ষিণা নামমাত্র। সামান্য কাঁচা ওল আর তৎসহযোগে কিছু লবণ। যাই হোক এক প্রকার নিস্তরঙ্গ জীবন কাটছিল দেবীর। কিন্তু হঠাৎ বিগত এক বছর থেকে তাঁর নাম-মাহাত্ম্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এখন অন্যান্য জেলা এমন কি অন্যান্য প্রদেশেও ধাক্কা মারছে। কারণ হিসাবে শোনা যাচ্ছে যেসব কথা সেগুলিতে পরে আসছি। পটভূমিকাতে কি আছে বলে স্থানীয় মানুষ দাবী করছেন তা শোনা যাক। প্রথমতঃ পান ব্যবসায়ী এক স্থানীয় ভদ্রলোক রাত্রে বাড়ী ফিরছিলেন সাথে প্রচুর টাকা নিয়ে। ডাকাতদল ছিল ওঁৎ পেতে। বালিকা বেশে দেবী ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে সাবধান করে দেন। ফলে টাকা খোয়াতে হয়নি। তবে ডাকাতের হাতের মৃদু চড়চাপড় মাত্র জুটেছিল। কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী ঘটা করে দেবীর পূজা দেন। কলকাতার চিৎপুর থেকে যাত্রা দল ভাড়া করে এনে জৌলুস করা হয়। দ্বিতীয়তঃ দেবীর কাছে মানত করে স্থানীয় এক বেকার যুবকের চাকুরীর সংস্থান হয়। তিনিও পূজা দেন মহা সমারোহে। দীর্ঘ দিন স্তিমিত থাকার পর দেবীর মাহাত্ম্য হঠাৎ স্ফুরিত হতে থাকে। সাথে সাথে প্রচারিত হয়ে যায় দেবীর থান সংলগ্ন ছোট্ট পুকুরটাতে স্নান করলে রোগমুক্তি ঘটে। এই মূল্যবান সংবাদখানি প্রচারিত ও প্রসারিত হতে অধিক সময় নেয়নি। সুযোগ বুঝে একদল পূজারী ব্রাহ্মণ আসরে অবতীর্ন হন। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেন এক মহিলা। তিনি স্থানীয়—তাঁর বাড়ীতে অস্ত্র ছিল 'মায়ে ভর'। তবে ব্রাহ্মণদের কাছে এই মহিলা

পরাজয় বরণ করেন ও রণে ভঙ্গ দেন। পূজারী ব্রাহ্মণদের দিন ভালই কাটছিল প্রণামীর বখরা নিয়ে। কিন্তু পরের ভাল অনেকে দেখতে পারে না। চক্ষুশূল হয় যে! স্থানীয় যুবকরা এবারে আগ্রহী হলেন। ব্রাহ্মণ শাসনের অবসান হলো। প্রতিষ্ঠিত হল যুবকতন্ত্র। এদিকে মায়ের নাম-মাহাত্ম্য আরো ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপারটা স্থানীয় এক বামপন্থীদলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁরা বিষয়টি বন্ধ করার প্রচেষ্টা নিতে গিয়েও থেমে গেলেন। কি কারণে তাঁরাই ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। তবে মনে হয় কারণ দুটি। প্রথমতঃ স্থানীয় কিছু মানুষকে বিরাগভাজন করা আখেরে ভাল না হতে পারে। ভোটের বাক্সকে কেন্দ্র করে রাজনীতির চক্র আবর্তিত হয়ে থাকে যে! দ্বিতীয়তঃ মানুষের 'ধর্মবিশ্বাস'কে আঘাত করা তাঁদের নাকি নিষেধ।

এদিকে ক্রমশঃ পুণ্যকামী স্নানার্থীর সংখ্যা বাড়ছে দিনে দিনে। স্থানীয় গ্রামগুলি তথা—নাগের মহল, টেপাখালি, উধোরবেড়ে, তেঁতুলতলা খেরী, মানিকনগর, বামুনের চক, পিন বাড়ি ইত্যাদি থেকে সমাগত 'আটটা নটার সূর্য্যরা' মিলে গঠন করলেন 'শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী কমিটি।' কমিটির মধ্যে যথারীতি সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি আছেন। আছেন শতাধিক সদস্য। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার সারাদিন তো বটেই অমাবস্যা আর পূর্ণিমার দিনেও প্রচুর ভিড় পুণ্যার্থীদের। সে জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রমে অনলস স্বেচ্ছাসেবীরা আছেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। প্রথমে তাঁরা পেতেন দৈনিক দু টাকা করে টিফিন খরচ, ঘুঘনি আর মুড়ি। এখন 'মায়ের কৃপায়' সেটি বেড়ে হয়েছে দশ টাকা। প্রণামীর টাকা জমা হয় কিছু। কিছু টাকা দিয়ে মায়ের মন্দির নির্মিত হচ্ছে। আর একটি বিশ্রামাগার। কোনো ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেল না। যাই হোক কমিটির মধ্যে স্থানীয় গ্রামগুলি ছাড়া অন্যান্য স্থানের মানুষের সদস্য-পদ গ্রহনে কোনো আপত্তি নেই। এই উদারতার কারণ কি সেটি স্বচ্ছ নয়।

নাগের মহলে বিশালাক্ষী থানে আসতে হলে ডায়মন্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ-নামখানা যাবার যে রাস্তা সেই রাস্তায় বাসে এসে নামতে হবে পাঁচ নম্বর লাটে। তারপর পূর্বদিকে যেতে হবে ইট বাঁধানো সড়কে। সাইকেল ভ্যান চলে প্রায় একশ। এই সাইকেল ভ্যান চালকদের ইউনিয়ন হয়েছে। সিটু সমর্থিত। প্রায় আট কিমি রাস্তার কিছুটা বেশ চওড়া। স্থানীয় এক প্রভাবশালী বাম নেতার ভদ্রাসন পর্যন্ত। তারপর রাস্তা সংকীর্ণ। মেরামতিও যথেষ্ট নয়। কাকদ্বীপ এককালের সংগ্রামী নাম। তেভাগা আন্দোলনের কথা কারো অবিদিত নয়। সুতরাং রাজনীতি সচেতন স্থান হিসাবে একে অভিহিত করলে অতিভাষণ হবে না। যাইহোক নাগের মহল বাপুজী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। বর্তমানে ক্ষমতায় আছে কংগ্রেস (ই) দল। আগে ছিল সি পি এম। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতে এঁদের অনেক আসন হারাতে হয়েছে। তেমনি হারাতে হয়েছে বাপুজী গ্রাম পঞ্চায়েত। এলাকাতে বি জে পি দলের কোনো সংগঠন নেই। এস ইউ সি দলের কোনো প্রভাবও নেই এখানে। গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হলেও পঞ্চায়েত সমিতি সি পি এম দলের হাতেই আছে। জেলা পরিষদও এঁদের। শাসনাধীন বিধায়ক এবং সাংসদ দুজনেই সি. পি. এম দলের। (সুন্দরবনে পরমাণু চুল্লী বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য বড়ই আগ্রহী সাংসদ মহাশয়) প্রাপ্ত সংবাদে বোধগম্য হয় এইসব জনপ্রতিনিধি নাগের মহলে শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী দেবী মহিমা প্রকাশেও উদাসীন। উদাসীন স্বাস্থ্য দপ্তরও। পানীয় জলের কোনো উৎস নেই সংশ্লিষ্ট স্থানটিতে। 'পুণ্যিপুকুরের' জল মানুষ খাচ্ছে বাধ্য হয়ে—অবশ্য ভক্তি ভরে। পাশেই আমন ধানের মাঠ। যখন মাঠে জল ছিল, মানুষ সেই জলও খেয়েছে। সেই জলে এক সংগে রাসায়নিক সার ও পুণ্যার্থীগণের মূত্রের সহাবস্থান!

মেলায় দিনে অসংখ্য অস্থায়ী দোকান বসে। ঘুঘনি, পাঁপড়, তেলেভাজা, কটকটি, পরোটা, মিষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু খাবার না খেলে দোকানী জলদানের পুণ্য অর্জন করতে নারাজ! মেলাতে যে খাবারগুলি বিক্রি হয় তা ততোধিক নিম্নমানের ও স্বাস্থ্যহানিকর। স্থানীয় কাকদীপ থানা, মহকুমা শাসকের ও মহকুমা পুলিস অফিসারের ডায়মণ্ড-হারবারস্থিত অফিসের গোচরীভূত হয়েছে বিষয়টি। কিন্তু তাঁরা আলো দেখাতে উদাসীন। বরং তাঁদের কেউ কেউ ওই পুণ্যিপুকুরে অবগাহন করে ধন্য রয়েছেন বলে শোনা গেল।

হ্যাঁ দোকানের কথা বলছিলাম। দোকান বসে এখন প্রায় তিনশ সত্তরটি। দু-একটি ছাড়া সবই অস্থায়ী। দৈনিক দক্ষিণা দিতে হয় কমিটিকে। মাত্র দু টাকা। আছে অসংখ্য ফেরীওয়ালা। তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা হয় না। রেহাই দেওয়া হয়।

কিছু কিছু দৈনিক সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতে কমিটি বিরক্ত। বিশেষ করে আজকাল ও ওভারল্যাণ্ড দৈনিক দুটির উপর। স্থানীয় এক মানুষ অভিযোগ করলেন—কোনো এক যুক্তিবাদী সংগঠনের ব্যক্তি তথা সাংবাদিকও ওই পুকুরে স্নান করেছেন—যেমন করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বি ডি ও মহাশয়। ইতিমধ্যে কাকদ্বীপের এক বিজ্ঞান-সংগঠনের সাথে যুক্ত শিক্ষক মহাশয় প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করেছেন। তাঁর বক্তব্যে আছে কুসংস্কার বিরোধী যুক্তি। মন্দিরের বর্তমান সর্বসময়ের রক্ষক (পুরোহিত নন) কালিপদ দাস প্রচার পত্রের কথা বলতে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ফেললেন—'মাগো তোর মহিমে ওরা বুঝলো না। বলে কি না আমরা ব্যবসা করছি। বিচের কর মাগো।'

এই মায়ের 'মহিমে' প্রচার করতে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় যুবক—শঙ্কর দাস। দুটি পুস্তিকা ছাপিয়েছেন। তুমুল বিক্রি হচ্ছে। নিউজপ্রিন্টে ছাপা আট-পৃষ্ঠার বইতে আছে শ্রীশ্রী বিশালাক্ষীর মাহাত্ম্য। প্রথম পুস্তিকা 'বিশালাক্ষীর পাঁচালী'। দ্বিতীয়টির নাম 'বিশালাক্ষীর মাহাত্ম্য'। উভয় পুস্তিকার মূল্য ধার্য হয়েছে দু টাকা। পয়ার ছন্দে রচিত। চোদ্দ মাত্রার বিষয়টি অবহেলিত। আঞ্চলিকতা দোষ সর্বাঙ্গে। স্থূল ব্যবসায়িক বুদ্ধির ক্লেদ পুস্তিকা দুটির জন্ম দিয়েছে।

নাগের মহলের রমরমা উৎসাহিত করেছে অন্যান্য অঞ্চলের কিছু লোভী দেবতা-ব্যবসায়ীদেরও। যেমনটি হয়েছিল বারুইপুরের 'ডাব বাবার' ক্ষেত্রে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানে 'ডাববাবার' অনুকরণে রোগের চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কয়েক মাস আগে নাগের মহল থেকে প্রায় দশ কিমি দূরে কুলপী থানার ঈশ্বরীপুর গ্রামেও পুণ্যিপুকুরের কারবার শুরু হয়ে যায়। পরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন শুরু হয়েছে মন্দির বাজার থানার রঘুনাথপুর গ্রামে। সরদারদের দেবোত্তর পুকুরে শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী মাতা নয়, 'বাবা পঞ্চাননের দয়া' হয়েছে। সেখানেও স্নানপর্ব চলছে। তবে এখনো জমে ওঠেনি। স্থানীয়-ভাবে কোনো প্রতিরোধও এখনো গড়ে ওঠেনি।

এবারে নাগের মহলের শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী থান যে মৌজাতে অবস্থিত সেই নেবুতলা মৌজার দিকে নজর দেওয়া যাক। 1991-এর জনগণনার প্রতিবেদন আপাতত হাতে না থাকায় 1981-র প্রতিবেদনটি পড়ে দেখা যেতে পারে। নেবুতলা মৌজার আয়তন 475.91 হেক্টর। জনসংখ্যা 2,203 জন। ঘরবাড়ি 403টি। প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে 3টি। চিকিৎসার বন্দোবস্ত কিছু নেই। 5-10 কিমি দূরত্বে চিকিৎসার সুযোগ মিলবে। পানীয় জলের জন্য নলকূপ আছে। ডাক ও তার ব্যবস্থা নেই। নিকটতম ডাক-তার অফিস 5 কিমি দূরে। হাট-বাজার নেই। নিকটতম হাট-বাজার পাওয়া যাবে 5-10 কি মি পথ অতিক্রম করার পর। নিকটতম শহর ডায়মণ্ডহারবার 40 কিমি পথ।

নেবুতলা মৌজা থেকে কাঁচা সড়ক দিয়ে 5-10 কিমি যাবার পর ডায়মণ্ড-হারবার যাবার বাস রাস্তা মিলবে। মৌজায় বিদ্যুৎ নেই। সেচের জল নেই। বন এই মৌজাতে নেই। চাষ হয় এমন জমির পরিমাণ—462·56 হেক্টার। অকর্ষিত ভূমির পরিমান 13·35 হেক্টার। মৌজাতে কোনো ধর্মীয়, ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন বা স্থান নেই।

এবার সমগ্র কাকদ্বীপ থানার দিকে তাকানো যাক। একই প্রতিবেদনে।

আয়তন —476·8 বর্গ কিমি

জনসংখ্যা—1,66,777

ঘরবাড়ি —28778

বিদ্যাস্থান—প্রাথমিক—153

মিডল — 34

মাধ্যমিক—28

উচ্চমাধ্যমিক—3

স্বাস্থ্যব্যবস্থা—

ডিসপেনসারি—8

স্বাস্থ্যকেন্দ্র —2

শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র—3

রেজিষ্ট্রীকৃত চিকিৎসক—7

অন্যান্য —1

নেবুতলা ছাড়া কাকদ্বীপ থানাতে আরো 47টি গ্রাম আছে। প্রায় প্রত্যেকের অবস্থা নেবুতলার মতই। একমাত্র কাকদ্বীপে অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। অবশ্য বিগত 1981-এর জনগণনার পরে সুযোগ সুবিধা নিশ্চয় কিছু বর্দ্ধিত হয়েছে—এমন আশা করা অন্যায় হবে না। তবে লোকসংখ্যাও বেড়েছে। সুতরাং প্রতীয়মান হয় কাকদ্বীপের মানুষ সেই তিমিরেই আছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে থানায় একটি মাত্র ডিগ্রি কোর্স পর্য্যন্ত পড়ার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—'সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়'। কাকদ্বীপেই। সমগ্র সাগরদ্বীপ, নামখানা, পাথর প্রতিমা, মথুরাপুর কুলপীতে কোন কলেজ নেই। সহায়সম্বল আছে এমন অভিভাবক মাত্র তাঁদের সন্তানদের কলেজে পড়াতে পারেন বাইরে রেখে। স্থানীয় মুসলীম জনগণের জন্য একটি মাত্র মাদ্রাসা আছে। তার অবস্থান পাঁচ নম্বর লাট থেকে পশ্চিম-দিকে প্রায় 3 কিমি পথের দূরত্বে।

সুতরাং শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত বলাই সঙ্গত। সরকারী হিসাবে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় মোট জনসংখ্যা 57,08,260 জন। এঁদের মধ্যে স্বাক্ষর মানুষ হচ্ছেন 25,55,470 জন। অবশিষ্ট মানুষ নিরক্ষর। তাঁদের একটা অংশই বাস করেন কাকদ্বীপ থানা এলাকাতে। এ হিসাব পাওয়া গিয়েছে 1991 সালের জনগণনা ভিত্তিক এক রচনা থেকে। রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবংগ পত্রিকার 5ই নভেম্বর 1993 সংখ্যাতে। রচনার নাম—পঞ্চায়েত ও সাক্ষরতার আন্দোলন। লেখক মেহবুব জাহেদী। যাই হোক এ কথা মানতে অসুবিধা নেই যে অশিক্ষার অন্ধকারে শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী দেবীর চলার পথ সুগম হয়েছে।

স্বাস্থের প্রসঙ্গে আসি। কাকদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী থানাগুলির চিকিৎসা ব্যবস্থা অতিশয় করুণ। সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার নার্স, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ওষুধ ইত্যাদির চিরসঙ্গী অভাব। এর মাঝেই বেলপুকুরে (থানা কুলপী) এক ডাক্তার এলেন। ওখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দেবার পর জন-কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু পরে তাঁকে নানা সরকারী-বেসরকারী বাধা ও হাতুড়ে চিকিৎসকদের ক্ষোভের সামনে পড়তে হয়। ফলে তাঁর কর্মোদ্যোগের ধারা হারিয়ে গিয়েছে মরুপথে।

সাপে কাটা রোগী নিয়ে বহু মাইল পথ অতিক্রম করে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে উপস্থিত হবার পর জানা যায় প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশান নেই। এ চিত্র সুন্দরবনের সর্বত্র। বিগত বৎসরে আন্ত্রিক মহামারীর সময়ে দেখা গিয়েছে একই চিত্র। অথচ সরকারী ভাষ্যে বেশ সুমিষ্ট সুর ভেসে আসে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রকাশিত—'পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছর' পুস্তকে পরিসংখ্যান দেখান হচ্ছে—স্বাস্থ্য বাবদ মাথা পিছু খরচ 1976 সালে ছিল

15 টাকা 90 পয়সা। 1985 সালে বাড়িয়ে করা হয়েছে 37 টাকা 09 পয়সা। কিন্তু ইতিমধ্যে টাকার মূল্য কতটা হ্রাস পেয়েছে, তা বলা হয়নি। বড় বড় করে লেখা আছে 'বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা নীতির সার কথা হলো, রাজ্যের ব্যাপকতম অংশের জনগণের জন্য প্রতিরোধ মূলক/নিবারক তথা সমাজমুখী স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি।' চিকিৎসার সুযোগহীন সাধারণ মানুষ সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বাঁচার জন্য তাই শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবীর চরণ বন্দনা করবেন—তা আর আশ্চর্য্য কি ?

অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সাথে যুক্ত হয়েছে কুসংস্কার। বিগত সনের আন্ত্রিক মহামারীর শিকার মরণাপন্ন রোগীকে সারাবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে ওঝা বা গুণীনকে। ওঝা এসে ভূত তাড়িয়ে দেন—সাথে সাথে রোগীকেও তাড়িয়ে দেন জগৎ থেকে। যে দেশে পদার্থবিদ হাতে আংটি, বালা পরেন, লোকসভার শপথ বাক্য পাঠ করাবার জন্য পাঁজীতে ভাল সময় দেখা হয়, মন্ত্রীরা বাবাজীর পাদোদক পান করেন সে দেশের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ দারিদ্র্য-শোষন-বঞ্চনার শিকার হয়ে কুসংস্কার গ্রস্ত হয়ে পথ হারিয়ে অন্ধকারে মুখ গুঁজে ধরাশায়ী হবেন তাতে আর বিস্ময় কিসের ? তাই শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী দেবী তথা তাঁর ভক্তবৃন্দের বাজার ভাল হবেতো বটেই। এর বিপরীতে যখন শুনি শ্লোগান—'২000 সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য', তখন ঘৃণায় মনটা পরিপূর্ণ হয়েই যায়। যাক পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নাগের মহলের শ্রীশ্রী বিশালাক্ষীর 'কল্যাণে' যে সব রোগী সারছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে তা যদিও সীমিত তবুও তা সম্ভব হচ্ছে কি কারণে ? মনোবিজ্ঞানে বলে এ ধরনের আরোগ্য লাভ হচ্ছে বিশ্বাস বলে আরোগ্য বা Faith Healing। আপাততঃ এই বলে বা ভেবে আত্ম প্রবোধ দিয়ে আত্মবঞ্চনা করে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানছি। □

বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

সহায়তা :

1. Census Report 1981—Govt. of India
2. মেস্‌মেরিজম—যাদুকর পি সি সরকার
3. 'পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছর'—তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঙ্গ সরকার
4. 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা বর্ষ 27, সংখ্যা 17
5. জ্যোতির্ময় মাঝি—ডাককর্মী, দক্ষিণ কোলকাতা বিভাগ

বীজ নিয়ে কৃষক আন্দোলন

প্রসঙ্গ কৃষি : এক

কর্ণাটকের কৃষক সংগঠন কর্ণাটক রাজ্য রাইথা সংঘ 'বীজ সত্যাগ্রহ আন্দোলন' শুরু করেছিল ২ অক্টোবর ১৯৯২। কর্ণাটকের হসপেটে কৃষক সমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে, সরকার ভারতে বীজ ও খাদ্য উৎপাদনে বহুজাতিক সংস্থার অংশগ্রহণের যে নীতি গ্রহণ করেছে, কৃষকরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে।

কর্ণাটক রাজ্য রাইথা সংঘের বীজ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একটা ধারাবাহিকতা আছে। ১৯৮০ সালে সংঘের জন্ম থেকেই বীজ-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন তোলা হয়েছিল 'সবুজ বিপ্লব' নামে প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে যে বীজ চালু করা হল তাকে ঘিরে। এই যে উচ্চ ফলনশীল নামের বীজ মেনে নেওয়া হল তার জন্য দরকার পড়েছিল রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশকের। এর ফলে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা নষ্ট হল, মাটির নানারকম রোগ দেখা দিল। বীজের বৈচিত্র্য হারিয়ে গেল। ফসলের বৈচিত্র্য হারিয়ে গেল। এক একটা জমিতে শুধু এক একটা ফসল ফলানো হল। সংঘ এর প্রতিবাদ করেছিল।

বীজকে ঘিরে দ্বিতীয় বিষয় এই উচ্চফলনশীল বীজ ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি খরচ সাপেক্ষ। সাধারণ কৃষকের ক্ষমতার বাইরে। একে চালু করতে গিয়ে তখন বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছিল। ঋণের খানিকটা ব্যয় করা হতো বিদেশ থেকে বীজ, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক এইসব আমদানী করতে, খানিকটা ব্যয় করা হতো কৃষকদের ভরতুকি দিতে যাতে তারা তাদের চাষে এই সব ব্যবহার করে। এখন বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ ঋণ দেবার শর্ত হিসাবে বলছে ভরতুকি দেওয়া চলবে না। কৃষকদের এতদিন এই ধরণের খরচ সাপেক্ষ চাষ পদ্ধতির মধ্যে টেনে নিয়ে এসে তাকে অভ্যস্ত করিয়ে এখন বলা যে ভরতুকি দেওয়া হবে না, এটা আসলে দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে ওলট পালট করা। সংঘ এর প্রতিবাদী।

বীজ প্রসঙ্গে তৃতীয় বিষয় ডাঙ্কেল প্রস্তাব ভিত্তিক গ্যাট চুক্তির ধারা। যে ধারা অনুযায়ী একজন কৃষক বীজ সঞ্চয়, বীজ সংরক্ষণের অধিকার হারাবে। কৃষক সমাজ তার বীজ সম্পর্কে পরম্পরাগত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে। যে ধারা অনুযায়ী বিদেশী বীজ কোম্পানীগুলোর বীজের উপর একচেটিয়া মালিকানা তৈরী হবে। সংঘ এই ধারনার বিরুদ্ধে।

বীজ নিয়ে চতুর্থ বিষয় ভারত সরকারের সাম্প্রতিক অর্থনীতিক নিয়ম কানুন। যে কানুনে ভারতে বহুজাতিক বীজ কোম্পানীগুলোর ব্যবসা করতে আসা। সংঘ এই কানুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

বীজের এই নানান বিষয় নিয়ে কর্ণাটক রাজ্য রাইথা সংঘ বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ১৯৯১ সালে ২ অক্টোবর ব্যাঙ্গালোরে কৃষক সমাবেশ, ১৯৯২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্গালোরে আলোচনা সভা, ২ অক্টোবর হসপেটে কৃষক সমাবেশ, ২৯ ডিসেম্বর কারগিলের দপ্তর আক্রমণ। ১৯৯৩ সালে ৩ মার্চ দিল্লীতে কৃষক সমাবেশ, জুলাই

মাসে কার্গিলের খামার আক্রমণ, ১৫ আগষ্ট কর্ণাটকে জেলা কালেকটরদের কাছে কৃষকদের প্রতিবেদন জমা দেওয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে কৃষক সমাবেশ।

এরই ধারাবাহিকতায় ২ অক্টোবর ১৯৯৩ ব্যাঙ্গালোরে বীজ সত্যাগ্রহের প্রথম বার্ষিকী পালন। সভায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং ইথিওপিয়া, ফিলিপাইনস্, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, নিকারাগুয়া, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, জিম্বাবোয়ে থেকে কৃষক আন্দোলনের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বিজ্ঞানীরা। সমাবেশে যে বক্তব্য রাখা হয় তার সারসংক্ষেপ এই রকম। বীজের ওপর কৃষকদের অধিকার শুধু ভারতে নয় বিশ্ব জুড়ে। বীজের ওপর একটা জাতির ও জনগণের অধিকারের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে জাতীয় উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা। গ্যাট চুক্তিতে বীজের ওপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে দিয়ে তা বহুজাতিক সংস্থার হাতে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিষয়ে কৃষকের অধিকার রক্ষা করতে হবে।

জৈব বিষয়ের ওপর মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য, গ্যাট চুক্তির এই ধারনাকে অস্বীকার করতে হবে। কোন শস্য বুনতে হবে, কোন বীজ বপন করতে হবে—এই জ্ঞান ঐতিহাসিকভাবে কৃষকদের, কোন ব্যবসায়ী সংস্থার নয়। কৃষকদের জ্ঞান থেকে ব্যবসায়ী সংস্থার মুনাফা করার কোন অধিকার নেই। বরং মেধাজাত সম্পত্তির ওপর সাধারণের অধিকারের ধারনাকে মান্য করতে হবে। এই দেশে এবং বিশ্বে কৃষকদের মধ্যে বীজ বিনিময়ের যে স্বাধীনতা এখন পর্যন্ত চালু আছে, তা স্বীকার করে নিতে হবে।

সমাবেশে আটটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

* কৃষকরা কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশ বিরোধিতা করবে।

* তৃতীয় বিশ্বের কৃষকরা তাদের জৈব সম্পদের ওপর গোষ্ঠীর মেধাজাত সম্পত্তির অধিকারের ধারনা মান্য করে ও করবে।

* কৃষকরা তাদের দেশ থেকে জৈব সম্পদ বের করে নিয়ে যাওয়ার যে কোন চেষ্টা আটকাবে। তৃতীয় বিশ্বের কৃষকদেব মধ্যে বীজ ও জৈব সম্পদের স্বাধীন বিনিময় তাদের সংস্কৃতির অংশ। এই বিনিময় চালিয়ে যেতে হবে।

* একটা দেশের জরুরী বিষয় খাদ্য নিরাপত্তা। প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা থাকবে তাদের কৃষিনীতি প্রণয়ন করার।

* যারা, স্বদেশী হোক কি বিদেশী, জৈব সম্পদের উপর মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার দাবী করবে, তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা কৃষকদের সাধারণ মেধাজাত সম্পত্তি অপহরণ করছে না।

* কৃষক সংগঠন গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিজেদের বীজ ব্যবহার ও বিনিময় করার জন্য গোষ্ঠীভিত্তিক বীজ সঞ্চয়াগার তৈরী করবে।

* কর্ণাটকে বিজ্ঞানীদের সাহায্যে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা তৈরী করা হবে। এই সংস্থার কাজ হবে কৃষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা, কৃষকদের অধিকার রক্ষা করা, অক্ষতিকারক কৃষিব্যবস্থা চালু করা।

* কৃষকরা নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে, নিজেদের অধিকার প্রসঙ্গে, চাষের ও ফসলের ভবিষ্যত সম্পর্কে উন্নয়নের চরিত্র বিষয়ে সচেতন রয়েছে। অধিকার রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলছে। □

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

নতুন কৃষি প্রযুক্তি ঃ কৃষকদের ভাবনায়

একটি সাক্ষাতকার ভিত্তিক প্রতিবেদন

প্রসঙ্গ কৃষি ঃ দুই

নতুন কৃষিপ্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা অনেক হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা করেছেন, কৃষিবিজ্ঞানীরা করেছেন, রাজনীতিবিদরা তো করেছেনই। এরই ফাঁকে, 1991 সালের শেষ থেকে 1992 সাল জুড়ে নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের মধ্যে হাজির হয়েছিলাম এ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে— উদ্দেশ্য ছিল কৃষকরা নতুন কৃষিপ্রযুক্তিকে কিভাবে দেখছেন তার মূল্যায়ন করা। কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম মোটামুটি ছয় ধরণের প্রশ্ন নিয়ে—

1) চাষ সংক্রান্ত 2) বীজ সংক্রান্ত 3) সার সংক্রান্ত 4) কীটনাশক সংক্রান্ত 5) উৎপাদন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত 6) বাজার সংক্রান্ত

সব কৃষক সব প্রশ্নের উত্তর দেননি। তাঁদের উত্তরগুলি থেকে নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ভাবনার একটা রূপরেখা এখানে তুলে ধরলাম।

চাষ সংক্রান্ত মতামত ঃ এই বিভাগে আটটি প্রশ্ন ছিল। মূল জ্ঞাতব্য ছিল গত পনেরো বছরে চাষের ক্ষেত্রে ফসল ভিত্তিক পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। অর্থাৎ পনেরো বছর আগে কি কি ফসলের চাষ হতো এবং এখন কি কি হয়। পরিবর্তনের কারণ কি ?

15 থেকে 45 বছর চাষের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৃষকরা বলেছেন আগে ধান, পাট, সরিষা, তিসি, আখ এবং বিভিন্ন ডালের চাষ হতো। এই চাষগুলি এখনও চলছে। এর সঙ্গে নতুন সংযোজন সব্জী, গম, কলা ও বাদাম। সামগ্রিকভাবে ফসল ভিত্তিক পরিবর্তন খুব একটা হয়নি। গমের চাষ আগেও ছিল, কম। এখন বেড়েছে। ডালের চাষ কমেছে। বেশীর ভাগ কৃষকদের মতে সেচের সুবিধার ফলে ডালের চেয়ে সব্জী, তৈলবীজ, গম ইত্যাদি আপেক্ষিকভাবে বেশী লাভজনক।

বীজ সংক্রান্ত মতামত ঃ এই বিভাগে একুশটি প্রশ্ন ছিল। উত্তরগুলির মধ্য দিয়ে আমরা জানলাম কৃষকরা সার্বিকভাবেই বীজের জন্য সাধারণ বাজারের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা মূলতঃ উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ কৃষকই প্রত্যেক বছর বীজ পরিবর্তন করেন না (তিরিশ জনের মধ্যে কুড়িজন, অর্থাৎ 66·7%)। একবার উচ্চফলনশীল বীজ বাজার থেকে কেনবার পর সেই বীজ থেকে পরের এক দুই বছর ফসল থেকে বাছাই করে নিজেরাই বীজ সংগ্রহ করে নেন। কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে বীজ নগদ মূল্যে অথবা শস্যবীজের ওজনে বিনিময় করে নিয়ে চাষ করেন। উচ্চ ফলনশীন বীজের সঙ্গে সঙ্গে দেশী বীজও ব্যবহার করেন এই রকম কৃষকের সংখ্যা তিরিশ জনে নয়জন, অর্থাৎ 30%। শুধুই দেশী বীজ ব্যবহার করেন এইরকম কৃষক নেই বললেই চলে। হাইব্রীড সীড (সংকরজাতি বীজ) ব্যবহার করেন তিরিশজনে ষোলজন, অর্থাৎ প্রায় 53·33% কৃষক। সংকর জাতীয় বীজ প্রধানতঃ সব্জী চাষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কৃষকেরা এক্ষেত্রে পরামর্শ পেয়েছেন মূলতঃ সরকারী কৃষি-আধিকারিক, প্রযুক্তি-সহায়ক এবং বীজ নিগমের কাছ থেকে। এই সংকর জাতীয় বীজের প্রচার এবং প্রসারে সরকারী মিনিকিট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কৃষকরা সাধারণভাবে পছন্দ করেন কম সময়ে অধিক ফলন দেবে এমন বীজ। দেশীয় ধানের বীজের মধ্যে কেলে, মানিক-

সুন্দু (মানিকসুন্দর), আউসবাকু, লক্ষ্মীচটা এবং হিজুলী প্রভৃতি জাতের চাষ এখনও কিছু কিছু অঞ্চলে হয়।

বেশীর ভাগ কৃষকই উচ্চফলনশীল বীজের উচ্চফলনশীলতায় আস্থাবান। কয়েকজন কৃষক উচ্চফলনশীল বীজের রোগ-প্রবণতা এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উচ্চফলনশীল বীজ এবং সাবেক দেশীয় বীজের তুলনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, গত তিনবছরে উচ্চফলনশীল ধানের উৎপাদনশীলতা ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। উচ্চফলনশীল ধানের উৎপাদন 17-20 মণ বিঘা প্রতি। দেশী ধানের উৎপাদন 7-8 মণ বিঘা প্রতি।

সার সংক্রান্ত মতামত ঃ একই জমিতে একই পরিমাণ ফসল ফলানোর জন্য রাসায়নিক সারের পরিমাণ বাড়ছে। বারংবার সারের পরিবর্তন করতে হচ্ছে। এদিকে জমির অম্লত্ব বেড়ে যাচ্ছে, জল ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলতঃ, সার্বিকভাবে জমির উর্বরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য কৃষকরা রাসায়নিক সার ছাড়াও জৈব সার ব্যবহার করেন, 'ধনচে' চাষ করেন। কেউ কেউ জমির উর্বরতা ধরে রাখার জন্য জমিকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন।

কীটনাশক সংক্রান্ত মতামত ঃ পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ছে। পোকা মাকড়গুলি নিত্য নতুন। উচ্চফলনশীল বীজে রোগ-পোকার আক্রমণ দেশীয় বীজের চেয়ে বেশী। এ ব্যাপারে প্রায় সব কৃষকই একমত। দেশীয় বীজ এবং জৈব সার প্রয়োগে চাষের সময় যে রোগপোকার আক্রমণ হতো তার প্রতিকার কৃষকরা জানতেন—এখন প্রতিকারের পরামর্শ নেন কৃষি বিশেষজ্ঞের, কীটনাশক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। ফলস্বরূপ, জমিতে কীট-নাশক ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। প্রতিবছর নতুন নতুন কীটনাশক বাজারে আসছে, আরও শক্তিশালী কীটনাশক ব্যবহারের ফলে উপকারী পোকা মরে যাচ্ছে, জমি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

উৎপাদন ব্যবস্থা সংক্রান্ত মতামত ঃ বেশীর ভাগ কৃষকই নিজের জমিতে নিজেই চাষ করেন। বাইরে থেকে লোকও নিয়োগ করতে হয়—বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য, বিশেষ বিশেষ সময়ে। চাষের জলের প্রয়োজন মেটান হয় (বৃষ্টি ছাড়া) সরকারী গভীর নলকূপ, শ্যালোর থেকে, সেচের সাহায্যে। জমিতে অনেকেই ট্রাক্টর ব্যবহার করেন, ভাড়া নিয়ে। যারা ভাড়া দেন তারা ব্যবসায়ী, অথবা অনেক জমির মালিক—নিজের জমির কাজের অবসরে ট্রাক্টর ভাড়া খাটান। আর, ব্যবসায়ীরা চাষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ নয়, আর পাঁচটা ব্যবসার মতন ট্রাক্টর ভাড়া দেওয়াও একটা ব্যবসা। প্রায় সব কৃষকই বলেছেন চাষে পরিশ্রম আগের চেয়ে বেড়েছে।

বাজার সংক্রান্ত মতামত ঃ দুটি বিশেষ প্রশ্নের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ কৃষকই উত্তর দিয়েছেন—যারা ফসল কেনে তারা বলে দেয় না কি কি ফসল ফলাতে হবে এবং তারা দাদনও দেয় না। চাষের খরচ মেটানোর জন্য বেশীর ভাগ কৃষক টাকা ধার করেন ব্যাংক থেকে—মূলতঃ গ্রামীণ ব্যাংক। চাষের খরচ মেটাতে না পেরে জমি বিক্রী করে দিয়েছেন এরকম ঘটনা জানা আছে কি না প্রশ্নের উত্তরে বেশীর ভাগ কৃষকই 'না' বলেছেন। তাঁদের মতে, জমি বিক্রী হয় মূলতঃ পারিবারিক কারণে। কোন ফসলের চাষ করবে তা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে বাজার দর বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে, ফসলের পাইকারী ক্রেতাদের ভূমিকা গৌণ। কলা অর্থকরী ফসল হিসাবে কৃষকদের কাছে খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে। বেশীর ভাগ কৃষকই উৎপাদন করেন প্রথমতঃ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং তারপর বাজারে বিক্রীর জন্য। □

অরূপ রতন মুখোপাধ্যায়

বিষয় ঃ পরিবেশ

[পরিবেশ নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে তার চেয়েও বেশী। আর সেটাই স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলোকে পাশ কাটাবার চেষ্টাই অস্বাভাবিক। অথচ তাই-ই ঘটছে। আমরা সেটা চাই না। তাই এই দপ্তর—বিষয় ঃ পরিবেশ।

দূষণের সমস্যার সমাধানের সূত্র বিজ্ঞান-কারিগরীতে যতটা, ততটাই সমাজে, সংস্কৃতিতে। মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর শেকড়টা এখানে। তারপর ছড়াক সে ডালপালা।

দপ্তর পরিচালনা-সম্পাদনার দায়িত্বে থাকছেন একটি ছোট্ট দল। কিন্তু লিখতে পারেন সকলেই।

পরবর্তী সংখ্যার আলোচ্য—দূষণ—কেন, কোথায়, কিভাবে। অনধিক এক হাজার শব্দের মধ্যে তিরিশে জুনের মধ্যে লেখা পাঠান। মতামতও পাঠাতে পারেন পৃথকভাবে। —সঃ মঃ]

দূষণ সমস্যা শুধু প্রযুক্তিগত নয়, মানবিকও

বিষয় পরিবেশ ঃ এক

পরিবেশ বিনা বেশে ছিলো বেশ আদিতে
পরি' সভ্যতার বেশ হয় তারে কাঁদিতে।
গাছপালা পশুপাখি মানুষের মিত্র,
তবু দেখো মানুষের মতি কি বিচিত্র—
নেই বাছ কাটে গাছ, পশুপাখি বন্দী ;
সুখ সম্পদ চেয়ে করে কত ফন্দী !—
জল মাটি বাতাসেরে করে বিষময়—
প্রকৃতি প্রেমের চোখে ঘোর বিস্ময়—
পৃথিবী তো একটাই, সে কারো অজানা নাই,
সন্ততিদের তরে কী বা রেখে যাই !
একটি আশার বাণী—কানে কানে কানাকানি—
জয় নয়, প্রকৃতির হতে হবে অনুগামী ;
মানুষ চেতনাময়, ইতিহাস পুরোগামী ;
পরিবেশ কল্যাণ মানুষই আনবে জানি,
মানুষেই পারে শুধু অসাধ্য সাধিতে।

পদ্যটা ভালোই, কিন্তু এসব ভাবাবেগ দিয়ে কাজের কাজ কতটুকু এগোবে বলতে পারো ?—অরুণের কথার ধরণেই বোঝা যায় সে তুষ্ট নয় এবং হয়তো কিছু বলতেও চায়। তাচ্ছিল্যটুকু তাই গায়ে না মেখে জানতে চাই—কাজের কাজ মানে ?

—মানে তো তোমরাই ভালো বুঝবে—অরুণ যেন বেশ উত্তেজিতই—কিন্তু তোমাদের এই মিঠি মিঠি কাব্যি আর মুঠি মুঠি সদিচ্ছা এসবের দাম কতটুকু ? গ্যাস লিক হলো কি দুর্ঘটনা ঘটল—মরলো, পঙ্গু হলো শ্রমিক, বস্তিবাসী। 'উন্নয়নের' প্রতিটি নতুন পদক্ষেপে বনজঙ্গলের সঙ্গে সমূলে ভিটে মাটি উচ্ছেদ হয় সেই দরিদ্র অরণ্যবাসী। আবার কারখানা দূষণ ঘটাচ্ছে, শোষন করছে না—বন্ধ করো কারখানা, ভুখা-মরুক শ্রমিক !

এতক্ষণে অরুণের উত্তেজনার কারণের হদিস পাওয়া গেল। উস্কে দেবার মতলবে বলি—সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগের কথা বলতে চাইছ ? এতো বেশ একটা সুলক্ষণই মনে হয়··· ·· ।

অরুণ যেন ফুঁসেই উঠল—সুলক্ষণ ? হবেও বা। আমি তোমাদের ভাষা বুঝি না, অন্যদেরও যে বুঝি তা হয় ; সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ···আচ্ছা বলতে পারো কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলোর কাজ কি ? তারা কি তাদের কাজ করছে না, নাকি করতে পারছে না ? তাদের হাতে কি যথেষ্ট ক্ষমতা নেই নাকি আইনগুলো, বিধানগুলো অবাস্তব ? নাকি সেগুলো এতই ত্রুটিপূর্ণ যে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না ? দূষণের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টই যদি শেষ কথা হয়, তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলো রেখে কি লাভ ? ···বেসরকারী প্রতিষ্ঠান না হয় মুনাফা শিকারী, বাধ্য না হলে দূষণ-নিরোধক ব্যবস্থার খরচ করতে চায় না। কিন্তু সরকারী উদ্যোগ, সরকারী প্রতিষ্ঠান কেন এ ব্যাপারে এত উদাসীন ? ···ঘটা করে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান হলো, এতো টাকা খরচ হ'লো, তবুও কেন আজ সুপ্রীম কোর্টকে নির্দেশ দিতে হয় চামড়া কারখানা, কাগজ কল, ডেয়ারী, রেল স্টেশন, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদিতে দূষণ রোধী ব্যবস্থা নাও, নতুবা বন্ধ করে দাও। ভালো কথা, বন্ধ করো, কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারী কেন ভুগবে ? তাদের দায় এক্ষেত্রে কি ও কতটা ?···এসব তো একটা দিক ; আর এক দিকে দেখো—ভারতের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বিশ্রী রকমের নোংরা এবং বিপজ্জনক। তেজষ্ক্রিয় দূষণও ঘটছে। কই তাদের কিছু বলা হচ্ছে না ! দূষণ বা দূষণ জনিত দুর্ঘটনায় পড়া ব্যক্তি মানুষ তো আজও সরাসরি ক্ষতিপূরণের মামলা করার অধিকারী নয়, সুপ্রীম কোর্ট তো সেখানে নীরব ! সমুদ্র পাহাড় জঙ্গলে, বাছাই করা জায়গায় স্থানীয় মানুষের রুটি-রুজি এবং প্রকৃতি পরিবেশের তোয়াক্কা না করে গড়ে উঠছে ফায়ারিং রেঞ্জ, মিসাইল টেস্টিং রেঞ্জ ইত্যাদি। গুলিগোলায় আহত এমনকি নিহতও হচ্ছেন অসতর্ক মানুষ। কে বলে তাদের কথা ? কে রোখে তাদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া, কে দেবে সুষ্ঠু পুনর্বাসন ? কার পক্ষ নেয় সুপ্রীম কোর্ট ?

আমি কিছু বলার চেষ্টা করতেই অরুণ থামিয়ে দেয়—এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাবো না। পারো তো উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো। অরুণ তার প্রশ্নের বন্যা অব্যাহত রাখে—সরকার, আমলা, বিশেষজ্ঞ, শিল্পোদ্যোগী সকলেই তো বেশ এক সুরে একযোগে পরিবেশ ও দূষণকে একটা গভীর, জটিল বৈজ্ঞানিক তথা টেকনিক্যাল বিষয় করে রেখেছে। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞরাই জানেন, বোঝেন, সমাধান শুধু তাঁদেরই হাতে। একদিকে এই বিশেষজ্ঞতার ঘেরাটোপ; অন্য দিকে মাঠে ঘাটে বক্তৃতা—পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা নিয়ে। যেন সাধারণ মানুষ অজ্ঞ, অসচেতন বলেই ঘটে চলেছে পরিবেশ দূষণ ! এ এক বিষম ধাঁধা। এই বিশেষজ্ঞতার শক্ত আবরণ কেউ আলগা করবে না। সরাবে না, কিন্তু তোমরাও তো কই সে চেষ্টা করো না।

অরুণ আমার চোখে চোখ রাখে।

—পাঠককে মানুষকে তোমরাও

শিক্ষিত করো না। অথচ তোমাদের তুলে ধরা একধরণের মূল্যায়ণ, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত আশা করো পাঠক বুঝবে, মেনে নেবে! তোমরা বলো, পরিবেশের কেন্দ্রে মানুষ, মানুষকে বাদ দিয়ে না হবে প্রকৃত উন্নয়ন, না হবে পরিবেশ সুরক্ষা। ভালো কথা, কিন্তু কীভাবে?···টেকনিক্যাল বিষয়গুলোকে পুরোপুরি এড়িয়ে না গিয়েও তার সার কথা সহজভাবে তুলে ধরে তোমরা বোঝাতে পারো না সাধারণ মানুষের ভূমিকা ঠিক কোথায় কেমন হওয়া উচিত? কোথায় দূষণ রোধে কলকারখানা করাই উচিত নয়, বা থাকলে বন্ধ করাও উচিত, কোথায় উদ্যোগ চালানোর সাথে সাথেই দূষণ ঠেকানো যায়, কোথায় করা যায় নিয়ন্ত্রণ, কোথায় ঘটে যাওয়া দূষণ থেকে মুক্তি পেতে হবে। আর কোথায়ই বা দূষণের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে জনপ্রতিরোধ—মানুষের কাছে বিশ্বাস-যোগ্যভাবে কে তুলে ধরবে সেকথা? বিশেষজ্ঞ-বিজ্ঞানী, জনপ্রতিনিধি না ট্রেড ইউনিয়ন?

অরুণের মগ্নতা কাটাতে চাইনা, তাই নিঃশব্দে ওর হাতে তুলে দিই চায়ের কাপ। চুমুক দিয়ে অরুণ বলে চলে—এবার যেন সে অনেকটা আত্মগত।

—পরিবেশ দূষণের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা আছে কি না জানিনা। মানুষের জীবন-জীবিকা-সমাজ-সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল সবই তো তার পরিবেশের মধ্যে পড়ে। বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞরা কি তার হদিস রাখেন? সংজ্ঞায় কি ধরা পড়ে এই সম্পর্ক? তাছাড়া, যে কোন জীবন্ত সমাজ, জীবন্ত সংস্কৃতি বাইরে থেকে নিরন্তর আহরণ করে, আত্মস্থ করে, দূষিতও কি হয় না? এই যে আমাদের চারপাশটা এত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং কারিগরী ক্ষেত্রে। ভালো-মন্দ বোঝার অবকাশ নেই, ক্ষমতাও হয়তো নেই অধিকাংশ মানুষেরই। পরিবর্তন-কবলিত এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষটিও। হৈ হৈ করে ভাঙছে পুরনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ভাঙছে মূল্যবোধ।··· মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনা এবং ইত্যাদিরা নাকি ঘটাচ্ছেন সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশন; বাণিজ্যিক গ্লোবালাইজেশনের নীতিনিয়মও আমাদের মানতে হবে ডাঙ্কেল সাহেবের মর্জিমত! অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশনের হাত ধরে ঘটছে কারিগরির গ্লোবালাইজেশন—সঙ্গে নিয়ে পরিবেশ-দূষণ এবং তার নিয়ন্ত্রণের গ্লোবাল ধ্যান ধারণা। এ কি নিছক গ্রহণ, আত্মীকরণ? নাকি আমরা কবলিত হচ্ছি এক সামগ্রিক দূষণের—যার ধাক্কায় আমরা হয়ে পড়ব কক্ষচ্যুত, অবদমিত?···এখানে কোথায় কিভাবে সাধারণ মানুষ অংশ নেবে উন্নয়নে? তার সামগ্রিক পরিবেশের তোয়াক্কা কে করবে?

অরুণ চলে গেল। আমাকে একরাশ চিন্তায় ফেলে। □

রবীন মজুমদার

মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প—একটি পর্যালোচনা

লাটুরের ভূমিকম্প ঃ সত্য তথ্য আর গপ্পো

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, ক্ষয়-ক্ষতির দিক দিয়ে, ভারতের বুকে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোর অন্যতম হল 30 সেপ্টেম্বর '93র মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প। সরকারী হিসাবে মৃতের সংখ্যা অন্তত 12,000 এবং লাটুর ও ওসমানাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় দেড়লাখ লোককে গৃহহীন করেছে এই বিধ্বংসী ভূমিকম্প।

1 অক্টোবর সকাল থেকেই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এই বিপর্যয়ের সংবাদ। প্রাথমিক কিছু সংকোচের পর ভারত সরকার বিদেশী সাহায্য গ্রহণে সম্মত হয়। একই সাথে মহারাষ্ট্র সরকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে (যদিও দেশী বিদেশী গুটিকয়েক সংস্থা বাদে!)। জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বহু লেখাপত্র বেরিয়েছে এই বিপর্যয়ের চেহারা কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে। প্রশ্ন উঠেছে সরকার ও সরকারী মদতপুষ্ট নানা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে। রঙিন নানা ছবি সমেত সেই সব লেখার মধ্যে দিয়ে এই ভূমিকম্প ও ভবিষ্যতে এই ধরণের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আসলে কি জানা গেল সেটা খতিয়ে বুঝে নেবার প্রয়োজন আমরা অনেকেই বোধ করেছি। আরও বোধ করেছি দুর্গত মানুষদের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে। প্রাথমিক সরকারী হিসাবে প্রায় 500 কোটি টাকার প্রয়োজন (যা এখন প্রায় 1,116 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে) ত্রাণ কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য। একদিকে বছর বছর খরা-বন্যা কবলিত তথা নানা প্রকল্পের কাজে উৎখাত হওয়া লাখো মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে বিপুল অংকের টাকা। আমাদের শংকা—এই ত্রাণ কার্য কোথায় শেষ হবে।

অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে ভূমিকম্পের মূলগত পার্থক্য হল, খরা বন্যার মত এক্ষেত্রে দোষীদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ অত সহজ নয়। মনুষ্যকৃত কাজের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট বা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত দিয়ে ভূমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা বা পূর্বাভাষ করা যায় কি? যাহোক কিছু প্রচার করে বাজার গরম করাই বাজারী সংবাদ মাধ্যমের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই দূরদর্শনে ইউ জি সি-র অনুষ্ঠানে দেখান হয় যে উত্তরকাশীর '91 সালের ভূমিকম্পে ভূকম্পন একটি খাড়া তল (ভার্টিকাল প্লেন) বরাবর হওয়ায় তার বিধ্বংসী প্রভাব অল্প জায়গায় সীমিত ছিল আর লাটুরে তা আনুভূমিক তল (হরাইজন্টাল প্লেন) বরাবর বিস্তৃতি লাভ করায় ক্ষতি ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে হয়। তাই তীব্রতার দিক দিয়ে কম হলেও লাটুরের ভূমিকম্প মাপে বেশী ভয়ংকর। এই তথ্য যে শুধু ভুল তাই নয়, ভূবৈজ্ঞানিক দিক থেকে তা অসম্ভবও বটে। যে কারণে পৃথিবীর গভীরে ভূকম্পন সৃষ্টি হয় তা মূলগত ভাবে একই এবং প্রতিটি ভূকম্পনের সাথে একই ধরণের কয়েকটি তরঙ্গ জড়িত থাকে (পরিশিষ্ট 1 দেখুন) স্পষ্ট করে বলে রাখা ভাল যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাটুরের ভূমিকম্পের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য

নেই। তীব্রতার দিক থেকেও তা এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়। ব্যাপক প্রাণহানির কারণ অন্য। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

একইভাবে আনন্দমেলার পাতায় (27 অক্টোবর '93) "ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ" নামক শিরোনামের তলায় আলোচিত হয়েছে জাপানী উপকথায় বর্ণিত মাগুর মাছের আচরণ ও '78 খৃষ্টাব্দের চীনা বৈজ্ঞানিক জান হেন উদ্ভাবিত 5টি কপিকল ও ড্রাগনের মাথা লাগানো ভূমিকম্পের কেন্দ্র নির্ণয়ের যন্ত্রের কথা। ভারতের কোন্ কোন্ সংস্থায় এ নিয়ে জোর গবেষণা চলছে তার একটা তালিকা দিয়ে নিবন্ধটি শেষ হলেও আসল কথাটাই পরিষ্কার করে বলা হয়নি। বলা হয়নি যে কোন দেশেই ভূমিকম্পের পূর্বাভাষের নিশ্চিত কোন সূত্র আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি (পরিশিষ্ট 2 দেখুন)।

অন্যদিকে ইণ্ডিয়া টুডে-র পাতায় (31 অক্টোবর '93) রঙিন ছবি দিয়ে দেখান হয়েছে আমাদের দেশে (মাটির তলায় ?)ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন রিফ্ট বা ফল্ট (রিফ্ট হল ভূস্তরে প্রবল চাপের ফলে তৈরী হওয়া ফাটল, যা ভূস্তরে কয়েক কিমি থেকে 30-40 কিমি গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই ফাটলগুলো ধরে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে)। লেখা হয়েছে হিমালয় অঞ্চলে প্রবল ভূতাত্ত্বিক চাপের ফলে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বেঁকেচুরে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ এই রিফ্টগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলেও ভূমিকম্প সৃষ্টি করছে। অতএব শুধু লাটুর নয় কলকাতা, দিল্লীসহ ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলই নাকি ভূকম্প-প্রবণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং সাবধানের মার নেই। কিন্তু কতটা সাবধানতা ? কি কি ভাবে ? সে বিষয়ে অবশ্য কিছু বলা নেই পত্রিকায়।

এখানে বলা দরকার যে হিমালয়ে চাপের ফলে মধ্য-দক্ষিণ ভারতে রিফ্টগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে এমন ধারণা ভূবৈজ্ঞানিকদের নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার মত কোন তথ্য এখনও কেউ দেননি।

সমস্ত ভারতকে ভূকম্পন প্রবণতা ও ভূস্তরের গঠন অনুসারে 5টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল সবচেয়ে বেশী এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (যার মধ্যে লাটুর ও ওসমানাবাদ পড়ে) সবচেয়ে কম ভূকম্পন প্রবণ। কম মানে সেখানে কখনও ভূমিকম্প হবে না এমন নয়; হয়ত 500 বছরে 1 বার হবে। অন্যদিকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হয়ত প্রতি 50 বছরে এক বা একাধিক তীব্র ভূমিকম্প হতে পারে। জাপান কিংবা ক্যালিফোর্ণিয়ায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা যা, লাটুরে তার চেয়ে সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে অনেক কম। আরো মনে করিয়ে দেওয়া ভাল সম্প্রতি লস্-এঞ্জেলেসে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা রিক্টার স্কেলে ছিল 6·5, মৃতের সংখ্যা নগণ্য। 1991 সালে উত্তরকাশীর ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল রিক্টার স্কেলে 6·6, মৃত্যুর সংখ্যা 1,000। 1967তে মহারাষ্ট্রের কয়না অঞ্চলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 6·5, মৃত্যুর সংখ্যা 200 এবং লাটুরের তীব্রতা ছিল 6·2 বা 6·4, মৃত্যুর সংখ্যা 12,000। স্পষ্টতঃ এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির অন্য কারণ আছে। ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই অনেক বেশী সচেতন হতে হবে কিন্তু কাল্পনিক কারণ দেখিয়ে মানুষকে ভয় পাইয়ে দিলে কিংবা পরিপ্রেক্ষিতহীনভাবে সতর্কতার প্রশ্ন তুললে সরকারী কোষাগার থেকে মোটা অঙ্কের টাকা বার করা যাবে হয়ত কিন্তু মানুষের জীবন সুরক্ষিত হবে না। আজ কলকাতায় যদি একটা ভূমিকম্পের জিগির তোলা যায় আশু লাভ হবে কন্ট্রাক্টর-প্রমোটারদের। বাড়ী-ঘরের দাম আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাবে, যদিও আগের মতই সমস্ত নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিম্নমানের ঘরবাড়ী তৈরী হতে থাকবে।

তীব্রতার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম হলেও লাটুরের ভূমিকম্পে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির অন্যতম কারণগুলো হল ক) ভারি পাথর ও কাদামাটি দিয়ে তৈরী বাড়ী যা সামান্যতম ভূকম্পন

সহ্য করতে পারে না (সিমেন্ট জাতীয় জিনিষ ব্যবহার না করার জন্য পার্শ্ব-চাপ সহ্য করার ক্ষমতা এই ধরণের বাড়ীর খুবই কম)। যেহেতু ভারী পাথর দিয়ে তৈরী, ভেঙে পড়ামাত্র সেগুলো বাড়ীর ভেতরে থাকা মানুষদের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। খ) ভূমিকম্পের সময় ছিল রাত চারটে, গণেশ পুজোর বিসর্জন দিয়ে তখন গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ ঘরের মধ্যে ঘুমে অচৈতন্য ছিলেন। প্রাথমিক ধাক্কাটা আসার পরও অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি যে বেরিয়ে এসে বাঁচবেন। (গ) এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের উদ্ধার ও ত্রাণকার্য সঠিক ভাবে ও দ্রুত গতিতে করবার মত উপযুক্ত ব্যবস্থাদিও ছিল না। বস্তুত সৈন্যবাহিনী পেঁাছোনর আগে স্থানীয় কর্মকর্তারা বহু ক্ষেত্রেই প্রায় কিছুই করতে পারেননি। আশ্চর্যের কথা হলেও সত্যি, অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশটি। দলিত সম্প্রদায়ের এইসব মানুষরা থাকতেন গ্রামের প্রান্তসীমায়। বহুমূল্য সিমেন্ট তো নয়ই এমন কি বড় পাথরের চাঙড়ের শক্ত-পোক্ত বাড়ীও ছিল না তাঁদের। কাঠ, মাটি আর খড় দিয়ে তৈরী তাঁদের জীর্ণ কুটির ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ে। কিন্তু হালকা কাঠ খড় ভেঙে পড়ায় তাঁরা আহত হয়েছেন অল্পবিস্তর ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছেন (স্টেটসম্যান 14-10-93)।

আগাম সতর্কতা বনাম বিপর্যয়-উত্তর ত্রাণ ও উদ্ধার

এ কথা বলাই বাহুল্য যে যতটা দ্রুততার সাথে ঝটিকা বাহিনী 'অপারেশন ব্লু স্টার' সংগঠিত করতে পারে, তার শতভাগের একভাগ তৎপরতাও ভূমিকম্পে কবলিত মানুষদের উদ্ধারের জন্য দেখানর কোন পরিকাঠামো আমাদের দেশে তৈরী হয়নি। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, লাটুরের উদ্ধার কার্যে মহারাষ্ট্র সরকার নিঃসন্দেহে খানিকটা তৎপরতা দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উপদ্রুত বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে (যেমন হোলি, একুনচি, তাওসিগাদ প্রভৃতি গ্রাম) ঘটনার 48 ঘন্টা পরে অবধি কোন সাহায্য এসে পেঁছিয়নি। তবে শুধু গ্রামের বাইরে থেকে উদ্ধারকারী দল নয়—গ্রামের মানুষদের সাহায্যও অনেক সময় পাওয়া যায়নি। চোখের সামনে সমস্ত গ্রামকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে এবং বহু প্রিয়জনকে হারাবার অভিজ্ঞতার ধাক্কায় অনেকেই একেবারে দিশেহারা ও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। গ্রামে গ্রামে মানুষ শুধু কাঁদতেই থেকেছেন। তাদের বোঝাতে সময় লেগেছে যে শোকে দিশেহারা না হয়ে হাত লাগালে এখনও চাপা পড়ে বেঁচে আছে এমন কিছু মানুষের জীবন বাঁচানো যেতে পারে। অন্যত্র দেখা গেছে যে কৌতুহলী মানুষজন আশে-পাশের অঞ্চল থেকে এসে এমন ভীড় করেছেন যে ত্রাণকার্য চালাতে উদ্ধারকারী দল প্রয়োজন মত জায়গায় এসে পেঁাছতেই পারছেন না।

ভারি পাথর আর মাটির তৈরী বাড়ী যে ব্যাপক ক্ষতি ও জীবনহানির একটা বড় কারণ এটা পত্র-পত্রিকায় অনেকেই বলেছেন। একই চিন্তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল একটি আলোচনা সভায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান বললেন যে সঠিকভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়ার বিদ্যা আগামী দুই দশকেও মানুষ আয়ত্ব করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই মানুষকে এর সাথে বাঁচতে শিখতে হবে। যেমনভাবে জাপান বা আমেরিকার কোন কোন অংশের মানুষ শিখেছে। কিন্তু কিভাবে? ইণ্ডিয়া টুডে-তে বলা হয়েছে সারা ভারতই আজ ভূকম্পন-প্রবণ হয়ে উঠেছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জাপান কিংবা আমেরিকার মত ভূকম্পন-প্রতিরোধক ঘর বাড়ী কি বানানো সম্ভব? আমাদের কারিগরি-বিদ্যা, প্রশাসনিক কাঠামো ও অর্থনীতি কি এ ধরণের কোন প্রকল্প রূপায়ণে সহযোগী হবে? এমনটা করার প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কি? উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিবাসীরা ভূমিকম্পের সাথে অনেক বেশী পরিচিত। বিশেষ প্রশিক্ষণ বা বিপুল অর্থব্যয় ছাড়াই তাঁরা বংশ পরম্পরায় কাঠের বা বাঁশের এমন বাড়ী বানাতে

পেয়েছে, তাতে এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে যে সরকার নিজে ভবিষ্যত ঝুঁকি এড়াবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেবেন। তাঁরা সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রেই প্রতিরোধের দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার চেয়ে, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে 'ত্রাণ কার্যে' বেশি উৎসাহী। কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুনাফাটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশি। সম্ভবতঃ এখানেই গণবিজ্ঞান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলোর ভূমিকা। সরকার ও সরকারী সংস্থাগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার কাজটা তাঁরাই করতে পারেন।

কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলতেই পারেন যে উপরোক্ত মতামতের মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা আছে। একদিকে বলা হচ্ছে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ প্রায় অসম্ভব। এও বলা হচ্ছে যে 1962 সাল থেকেই মাঝে মাঝেই এ অঞ্চলে কম্পন ধরা পড়েছে—যার কোনটাই বিধ্বংসী নয়। তবে কি করে জানা যাবে যে 30 সেপ্টেম্বর রাত চারটেয় এই ভয়ংকর কাণ্ড ঘটবে? এ বিষয়ে কাউকেই দোষী করা যায় না।

অনস্বীকার্য এ অভিযোগ যে, ঠিক কখন এই বিপর্যয় আসবে তা বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আগাম যতটুকু আভাষ পাওয়া গিয়েছিল তাতে ভবিষ্যত বিপদের আশংকা অনুমান না করতে পারার কোন কারণ নেই। আমরা সকলেই দেখেছি কাগজে সেই ছবি যেখানে লাতুর গ্রামের সমস্ত বাড়ী ধ্বসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে একটি কি দুটি কংক্রীটের গাঁথনিওয়ালা বাড়ী এবং 40 ফুট উঁচু একটি জলের ট্যাংক। ভূমিকম্পের তীব্রতার মাপ কম হওয়া সত্ত্বেও, বাড়ীগুলোর কাঠামোগত দুর্বলতার জন্য যে ভয়ংকর বিপদ হতে পারে এটুকু বোঝার মত যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল। সেই ইঙ্গিতটুকু কতটা কাজে লাগিয়েছেন সরকার ও সরকারী বিশেষজ্ঞরা?

দৃষ্টিভঙ্গীর দুই দিক

একটু বাড়াবাড়ি শোনালেও বলতে বাধ্য হচ্ছি দোষটা শুধু সরকারী তহবিল থেকে খরচের নয়, দোষটা দৃষ্টিভঙ্গির ও সমাজ পরিকাঠামোর। সরকার তার সিদ্ধান্তের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের ওপরই নির্ভর করেন। ফলতঃ ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের ডাইরেক্টরের মত মানুষদের মতামত দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হন। তৃণমূল নাগরিক সংগঠন, গণবিজ্ঞান সংস্থা এদের মতামতের বিশেষ ভূমিকা নেই। থাকলে হয়ত বহু ব্যাপারেই আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম হত, যেমনটা হয়েছে মহারাষ্ট্রের বলিরাজা বাঁধের ক্ষেত্রে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া সংক্ষেপে জি এস আই, ভারতবর্ষে ভূবৈজ্ঞানিকদের সবচাইতে বড় প্রতিষ্ঠান। এখানকার ভূবিজ্ঞানীরা ভারতের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বছর বছর অনুসন্ধান চালান ভূস্তরের নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ভারতবর্ষের ভূতাত্ত্বিক কোন সমস্যা হলে আপনাকে প্রথমেই যেতে হবে এই বিশাল কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থার কাছে। ভূমিকম্পের সম্বন্ধে এখানকার অবস্থাটা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। গত ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জি এস আই-এর প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল একটি আলোচনা সভা, এই সভায় জি এস আই-এর জনৈক অফিসার সভাকে জানান যে উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন একটি সংস্থা এন জি আর আই-এর কাছে উপযুক্ত সাহায্য না পেয়ে, বাঁধ তৈরী করার ব্যাপারে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সংক্রান্ত কিছু কাজের জন্য জি এস আই-এর সাহায্য চেয়েছিলেন। এই কাজের জন্য তাঁরা কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি (মাইক্রো-সিস্‌মোগ্রাম—যা দিয়ে খুব সামান্য তীব্রতার ভূকম্পন মাপা সম্ভব) জি এস আই-কে দিতে রাজী ছিলেন। এই কাজটির জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মতামত চাইলে বড় কর্তারা জানান যে যেহেতু এই ধরণের মূল্যবান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কোন অভিজ্ঞতা বা তার রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামো

জি এস আই-তে নেই, অতএব এই ধরণের কোন কাজ করা সম্ভব নয়। এই স্বনামধন্য ভূবৈজ্ঞানিক জোরের সঙ্গে আমাদের এও জানান যে লাটুরের ভূমিকম্প নিয়ে এত আলোচনা করার কিছু নেই। প্রথমতঃ এ নিয়ে কাজকর্মের কোন ব্যবস্থা জি এস আইতে নেই। তাছাড়া তীব্রতার বিচারে বা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে লাটুরের ভূমিকম্প নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। 'লাটুরে একটি গাছও উৎপাটিত হয়নি, মাটির বুকে একটি ফাটলও দেখা দেয়নি।'

চমৎকার! 12,000 লোকের জীবনহানি ঘটিয়েছে যে ভূমিকম্প সে সম্পর্কে ভারতের বৃহত্তম ভূবৈজ্ঞানিক সংস্থার দায়িত্বশীল অধিকর্তাদের কি দৃষ্টিভঙ্গি! সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের এই বৃহত্তম সংস্থাটির বহু ভূবৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কাউকেই উঠে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করতে দেখিনি। ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত মানুষদের ব্যাপারে সরকারী সংস্থার ভূবৈজ্ঞানিকদের যদি কোন ভূমিকা না থাকে, তবে কেন সাধারণ মানুষের থেকে আদায় করা রাজস্বে বছরের পর বছর চলতে থাকবে এই সব সংস্থা?

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সরকারী সংস্থায় কাজ করার নানা সমস্যা, বাধা-বিপত্তি আছে। কিভাবে সে সমস্যা দূর করা যায় সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের সমস্যার সাথে একাত্ম বোধ না করার কোন যোগাযোগ নেই। আমরা জানি আগামী কয়েক বছরে সরকার ভূমিকম্পের বিপদ নিয়ে বহু কোটি টাকা ব্যয় করবেন এবং তখন এইসব 'দায়িত্বশীল' সরকারী অফিসাররা নানা কমিটির কর্ণধার হয়ে সেই 'পাবলিক মানি'র 'সদ্ব্যবহারের' নানা বন্দোবস্ত করবেন। প্রতিটি সৎ নাগরিকের উচিত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার, যাতে এই সংক্রান্ত ভবিষ্যত সমস্ত কার্যকলাপকে প্রশ্ন করার অধিকার তাঁদের থাকে।

জলাধার অথবা পারমাণবিক বিস্ফোরণ?

একটা প্রশ্ন বারে বারে উঠেছে যে দাক্ষিণাত্যের এই সব ভূমিকম্পের পিছনে গড়ে ওঠা ছোট বড় নানা জলাধার বা বাঁধের কোন ভূমিকা আছে কিনা। এই প্রতিবেদকের ধারণা, এ নিয়ে কোন স্পষ্ট উত্তর বৈজ্ঞানিকদের জানা নেই। বেশিরভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি মাটির নীচে, 5-7 থেকে 100 কিমি গভীরে। ক্ষেত্র বিশেষে তা অনেক গভীর হতে পারে। অত নীচে ঠিক কি কি ঘটে তা অনেকটাই অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুমান নির্ভর। তবে প্রথমত মাটির ওপরে 30-40 ফুট গভীর বিশাল জলাধার সৃষ্টি করলে তা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে খানিকটা বিপর্যস্ত করে। এই বিপর্যয় মাটির নীচে সক্রিয় নানা প্রক্রিয়াকে কি ভাবে প্রভাবিত করে জানা না থাকলেও, পৃথিবীর বহু জায়গায় বড় জলাশয় তৈরী করার পর কিছু কিছু ভূমিকম্প হতে দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত আমেরিকার কলোরাডো অঞ্চলে ড্রিল করার সময় বাড়তি তরল বর্জ্য, বেশি চাপে গভীর ড্রিল করা গর্তের মধ্যে চালান করে দেওয়ায় সেই অঞ্চলে ছোটখাট ভূমিকম্পের সংখ্যা বেড়ে যায়। মনে হয় মাটির নীচের ফাটলগুলো ওই তরল বর্জ্য দ্বারা পিচ্ছিল হলে অল্প চাপেই ভূস্তর সরে গিয়ে ভূমিকম্প ঘটে (পরিশিষ্ট-1 দেখুন)। '67 সালে কয়না বাঁধ অঞ্চলে একটি ভূমিকম্প হয়। যেহেতু তখন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ভূমিকম্পের দিক থেকে অনেক স্থিতিশীল অতএব অনেকেই মনে করেছিলেন যে 6·5 মাত্রার এই ভূমিকম্পের কারণ বাঁধ ও তৎসংলগ্ন জলাশয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে বার বার ভূমিকম্প হচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বরের পরেও কর্ণাটকের বিভিন্ন অংশে ও মহারাষ্ট্রে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে—রিক্টার স্কেলে যার মাত্রা 5। এ ছাড়াও ভূপদার্থবিদরা নানা কারিগরি কৌশলে এখানে মাটির গভীরে কিছু কিছু ফাটলের উপস্থিতি টের পেয়েছেন। ফলে অনেকেই এখন মনে করেন

ভূস্তরের আভ্যন্তরীণ কোন প্রক্রিয়ার জন্যই কয়না ও তৎপরবর্তী ভূমিকম্প-গুলো হচ্ছে। 'ভূমিকম্পের কারণ বাঁধ বা জলাশয়' এ ধারণা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

অন্যদিকে একটি দৈনিক পত্রিকায় আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে হয়ত মধ্য ভারতে কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে এই ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে। সন্দেহ জাগার একটা কারণ হল লাটুর ভারতের এক কম ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। তবে এ নিছকই ছেলেমানুষ সাংবাদিকের কল্পনা বিলাস মাত্র। অনেক দেশের সিস্‌মোগ্রামেই লাটুর ভূমিকম্পের কম্পন ধরা পড়েছে। সেই তথ্য থেকে প্রাথমিক হিসাবে মনে হচ্ছে এর উৎপত্তি স্থল 10 থেকে 13 কিমি গভীরে। অত গভীরে বিস্ফোরণ ঘটানো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া '62 সাল থেকে বেশ কয়েকটা ভূমিকম্প আজ অবধি ওই অঞ্চলে হয়েছে। এত-গুলো বিস্ফোরণ নিশ্চয়ই ভারতে ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই। অনু-সন্ধান চালাতে আসা বিদেশী সংস্থারাও এমনকি এরকম কোন সন্দেহ ব্যক্ত করেন নি।

আগাম সতর্কতা ঃ কি ও কেন

আগেই আলোচনা করেছি যে আগামী ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল কিংবা সময় সম্বন্ধে নিখুঁত পূর্বাভাষ দেওয়া খুব কঠিন। ফলতঃ সম্ভাব্য অঞ্চল-গুলোতে আগাম সতর্কতা নেওয়া দরকার। সতর্কতার মধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ভূমিকম্প-প্রতিরোধক ঘর বাড়ী এবং বিপর্যয় সামাল দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। অল্প খরচায় গ্রামের মানুষদের উপযুক্ত ভূকম্পন-প্রতিরোধী বাসস্থানের পরি-কল্পনা কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগেই তৈরী করা হয়েছে। এ কথা জানিয়েছেন রুরকীর ভূমিকম্প বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক শ্রী এস বসু। এই ধরণের বাড়ী তৈরী করার খরচা, এখন যে ভাবে বাড়ী বানানো হয় তার চেয়ে মাত্র 5-10% বেশি (ইন্ডিয়া টুডে, 31 অক্টোবর, 1993)। এই বাড়ী কিভাবে বানাতে হবে সে নিয়ে বিশদ লেখাপত্র বহুদিন আগেই ছাপানো হয়েছে। ইদানিং কালে বেশ কয়েক বার বিধ্বংসী ভূমিকম্প ঘটে যাওয়ার পরও সরকার অথবা অন্য কোন সংস্থা এই ধরণের বাড়ীর ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাননি বলে অভিযোগ করেছেন শ্রী বসু। পাশাপাশি সদ্য প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে সরকারী সংস্থাগুলোর হিসাব অনুসারে লাটুর অঞ্চলে 250 বর্গফুট মাপের একটি ভূমিকম্প প্রতিরোধক বাড়ী বানানোর খরচ 40,000 টাকা। বলুন তো, গ্রামে একটি সাধারণ বাড়ী বানানোর খরচ কত ধরা যেতে পারে? যদি তা 20,000 টাকাও হয়, তবে রুরকীর কৌশল ব্যবহার করলে খরচা 22,000 টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য এক মতে সুইডেনে আবিষ্কৃত 'ফেরো-সিমেন্ট' পদ্ধতি ব্যবহার করে একই ধরণের ভূমিকম্প-নিরোধক বাড়ী বানানোর খরচা 30,000 টাকার বেশী কখনই নয়।* এবং মহারাষ্ট্রের গোটা ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে সমস্ত ঘরবাড়ী এই পদ্ধতিতে পুনর্নির্মানের খরচ 100 কোটি টাকার বেশী মোটেই নয়, যে খরচের সরকারী হিসাব অন্ততঃ 500 কোটি টাকা।* আমাদের সন্দেহ হিসাবের ফারাক যত দিন যাবে তত বাড়বে!

শেষ করার আগে

ছ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে লাটুরের এই দুর্ঘটনার পরে। মহারাষ্ট্র সরকার কদিন আগে 1,116 কোটি টাকা ব্যয়ে ত্রাণকার্য সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন (স্টেটস্‌ম্যান, 25.3. 94)। এই পরিকল্পনায় কি কি আছে তার বিশদ আমরা এখনও জানি না। শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশ যে পুনর্বাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণ হবে।

★ রাকেশ সুদঃ নিড ফর অ্যান আর্থকোয়েক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটারিং প্ল্যান—থার্ড ওয়ার্ল্ড সায়েন্স এ্যান্ড এনভায়রণমেন্ট পারস্‌পেক্টিভ, ভি 2 ('93) নং 2, 32-33

এবং তার ফলে অন্তত 600 জন চাষী ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হবেন ! তবে সরকার আশ্বস্ত করেছেন যে এঁদের গ্রামীণ রোজগার যোজনার আওতায় আনা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জেনেছি যে এই বিশাল পরিকল্পনায় দুর্যোগ কবলিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কোন প্রচেষ্টার স্থান হয় নি। কি আশ্চর্য ! ভূমিকম্প জিনিষটা আসলে কি, কেন তা হয় এবং কেনই বা ভূমিকম্প প্রতিরোধক বাড়িঘর নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা, তা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জানানোর কোন প্রয়োজন বোধ করছেন না সরকার !

একটি ছোট্ট ব্যাপার বলছি। ভূমিকম্পের তীব্রতার মাত্রা প্রকাশ করা হয় রিক্টার গুটেনবার্গ স্কেলে। এই স্কেলে তীব্রতা পরিমাপক সংখ্যাটা—সিস্মোগ্রাফের রেখাচিত্র ও উৎস থেকে ভূকম্পন পরিমাপক কেন্দ্রের দূরত্ব দ্বারা একটি গাণিতিক ফর্মুলার থেকে বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেন। এই স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর যে কোন ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে যে কোন একটি ভূমিকম্পের তীব্রতা একই বেরোবে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কাছেই রিক্টার স্কেলের সংখ্যাগুলোর কোন বাস্তব তাৎপর্য নেই। বহুদিন থেকেই ভূবিজ্ঞানীরা পাশাপাশি আরেকটি স্কেল ব্যবহার করে আসছেন যেখানে তীব্রতা মাপার ভিত্তিটা হল ভূকম্পনের জন্য ধ্বংসের পরিমাপ। এই স্কেলটিকে বলা হয় মারকেলী স্কেল। উদাহরণস্বরূপ, মারকেলী স্কেলে তীব্রতা 3 মানে হল মৃদু ভূমিকম্পন যা কেবল শুয়ে থাকা লোকেরা টের পায় (অনেকটা একটা ভারী ট্রাক চলে গেলে যেমন কম্পন হয় তেমনটা)। রিক্টার স্কেলে এই তীব্রতার মাপ 4 বা 4 2। মারকেলী স্কেলে তীব্রতা 5 মানে, ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠবে, আসবাবপত্র কাঁপতে থাকবে, পেন্ডুলাম ঘড়ি থেমে যাবে ইত্যাদি (রিক্টার স্কেলে এর পরিমাণ 4·8) সাধারণ মানুষের কাছে এই স্কেল অনেক বেশি বোধগম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, না সরকারী প্রচার বিজ্ঞপ্তিতে না সংবাদ মাধ্যমে, মারকেলী স্কেলের ব্যবহার আছে। আসলে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার দায় এঁদের কারোরই নেই, বরঞ্চ দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারের একটা চমক আছে—সেটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় ! গণবিজ্ঞান সংগঠনগুলির এই দিকটাতে নজর দেওয়ার সুযোগ অনেক। মহারাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদে এ বিষয়ে তাদের ভূমিকাও খুব আশা ব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে না। ফলতঃ দুর্ঘটনার ছ'মাস পরেও নানা আশঙ্কা, ভীতি ও মানসিক চাপের মধ্যে দুর্গতরা দিন কাটাচ্ছেন এবং সেই সুযোগে নানা গুজব বুজরুকি তুক্-তাক্ আর ভড়ং ফলাও কারবার জমিয়েছে এই অঞ্চলে। সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে (স্টেটস্ম্যান, 30.3.94) কিলারীর সেই বিখ্যাত সরপঞ্চ ডাঃ এস ডি পর্সালগে, যিনি 1992 সাল থেকে বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অসংখ্য ছোট ছোট ভূকম্পনের ব্যাপারে, তিনি সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে যাবার হুমকি দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন পুনর্বাসন তো দূর অস্ত, গত ছ'মাসে কিলারীর মানুষ সরকারের কাছ থেকে ন্যূনতম ত্রাণ সাহায্যটুকুও পাননি।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার সরকারের অপদার্থতা প্রমাণের জন্য এই দীর্ঘ নিবন্ধের অবতারণা নয়—কারণ তা ইতিমধ্যেই বহুবার প্রমাণিত। ভূমিকম্পের পূর্বাভাষের অনিশ্চয়তা অথবা দাক্ষিণাত্যের মাল-ভূমিতে এত বড় ভূমিকম্প ভূবিজ্ঞানীদেরও বিস্মিত করেছে নিশ্চয়। কিন্তু যতটুকু আভাষ ছিল তার প্রতি দায়িত্বশীল মনোযোগ না দেওয়ায় কি বিপর্যয় ঘটতে পারে, লাটুরের ভূমিকম্প তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আর দুর্যোগোত্তর সময়ে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও গবেষণা প্রকল্পে থাকে অর্থকরী নানা দুরভিসন্ধি। বাজারী সংবাদ মাধ্যমের লক্ষ্য থাকে সত্য-মিথ্যা কিছু চমকপ্রদ গল্প বলে বিক্রী বাড়ানোর। আমাদের এ বিষয়ে আরেকটু সজাগ হতে হবে। গণবিজ্ঞান সংগঠনগুলোরও অনেক দায়িত্ব থেকে যায়—ত্রাণকার্য ও পুনর্বাসনের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে—যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনার মোকাবিলা আমরা অনেক জোরালো ভাবে করতে পারি।

□ তপন চক্রবর্তী

ভূমিকম্প কি ও কেন

পরিশিষ্ট : এক

মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরী পৃথিবীর ওপরের স্তরটাকে দেখতে যতই স্থিতিশীল মনে হোক না কেন আসলে সেটা নানা ভাবে নড়াচড়া করে। এই নড়াচড়া করার কারণ—পৃথিবীর অভ্যন্তরের নানা প্রক্রিয়া। এবং এর ফলে ভূ-ত্বকে বিভিন্ন চাপ বা টানের সৃষ্টি হয়। ফলে ভূস্তরের পাথরের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানা ধরণের ফাটল (ফ্র্যাক্‌চার)। চাপের ফলে এই ফাটল বরাবর দুপাশের ভূস্তর যদি হঠাৎ সরে যায় তবে সৃষ্টি হয় ভূকম্পনের। ফলে ভূস্তরের কোথায় কোথায় পার্শ্বচাপের সৃষ্টি হচ্ছে এবং কোথায় কোথায় বড় বড় ফাটল আছে তা জানাটা খুব প্রয়োজন, ভূমিকম্প কোথায় হবে তা বোঝার জন্য।

ভূস্তরের পাথরগুলোতে যদি কোন চাপের সৃষ্টি হয়, প্রথমে পাথরগুলো সেই চাপ সহ্য করতে চেষ্টা করে। হয়ত কোন কোন জায়গায় পাথরের স্তর খানিকটা বেঁকে যায়। যেমন একটা সরু, শুকনো গাছের ডাল নিয়ে দু প্রান্তে যদি আপনি দু হাত দিয়ে চাপ দেন, তা খানিকটা বেঁকে যাবে। আরও চাপ দিলে এক সময় তা ভেঙে যাবে এবং ভেঙে যাবার পর দুটো টুকরোই খানিকক্ষণ কাঁপতে থাকবে। পাথরের ক্ষেত্রেও তেমনি বহু বছর ধরে সঞ্চিত চাপের ফলে একসময়ে তা হঠাৎ ফেটে যায় এবং ফাটল বরাবর খানিকটা সরে যায়। 10 কিমি মোটা একটা পাথরের স্তরকে বাঁকাতে কত শক্তির প্রয়োজন তা সহজেই বোঝা যায়। এই স্তর ফেটে যাবার ফলে ফাটল বরাবর সরণ হওয়া মাত্র বহু বছরের সঞ্চিত এই বিশাল শক্তি মুক্তি পায় এবং আশেপাশের ভূস্তর কাঁপতে থাকে। ভূস্তরের এই কম্পনকেই আমরা ভূমিকম্প বলি। মাটির নীচে কোন একটা বিন্দুতে পাথর ফেটে প্রথম সরণ শুরু হয়। এই বিন্দুকে বলা হয় ভূমিকম্পের উৎস বিন্দু বা 'ফোকাস'। এই উৎস মাটির নীচে কয়েক কিমি থেকে প্রায় 700 কিমি গভীর পর্যন্ত হতে পারে। উৎস বিন্দুর ঠিক ওপরে পৃথিবীর যে অঞ্চলটা, তাকে বলা হয় উপকেন্দ্র বা 'এপিসেন্টার'।

গোটা পৃথিবীতে সারা বছর অসংখ্য ভূমিকম্প হয়—প্রায় 8 লাখের কাছাকাছি, যা আমরা টের পাই না—কেবল যন্ত্রে ধরা পরে (রিকটার স্কেলে 2-3·4)। আবার বেশী তীব্রতার ভূমিকম্প হয় বছরে প্রায় 100 (6·2-6·9)। সমস্ত ভূমিকম্পের উৎসবিন্দুগুলোকে মানচিত্রে ফেলে দেখা গেছে যে সেগুলোর 90 শতাংশ কতগুলো লাইন বরাবর অবস্থিত। যেমন প্রশান্ত বা অতলান্তিক মহাসাগরের মাঝ বরাবর, কিংবা দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম কূল ধরে, আলাস্কা ও জাপান বরাবর, অথবা জাভা, সুমাত্রা, বার্মা, হিমালয় হয়ে ভূমধ্যসাগরের কূল বরাবর। ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর ওপরের 100 কিমি মোটা স্তর, নীচেকার অর্ধগলিত স্তরের ওপর শক্ত খোলার মত ভেসে বেড়ায়। এই খোলাগুলোকে বলা হয় 'প্লেট'। পৃথিবীর সমস্ত ওপর ভাগটা এরকম গোটা বারো প্লেট দিয়ে তৈরী। যেখানে এই প্লেট নতুন করে সৃষ্টি হয় (যেমন প্রশান্ত ও অতলান্তিক সাগরের মাঝ বরাবর) অথবা যেখানে চলমান প্লেট গুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায় (যেমন হিমালয় পর্বত শ্রেণী) সেখানে ভূমিকম্প অনেক বেশী হয় (মোট ভূমিকম্পর 90 শতাংশ)। চলমান প্লেটের মধ্যেকার অংশগুলো মোটামুটি স্থিতিশীল (মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি), এখানে ভূমিকম্প হয় কম।

পৃথিবীর ওপর ভাগের গঠন নিয়ে যদি একটু ধারণা থাকে, তাহলে হয়ত কিছুটা আন্দাজ করা যায় যে কোথায় কোথায় কত তীব্রতার ভূমিকম্প হতে পারে (পরিশিষ্ট-1 দেখুন)। কিন্তু যেখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় অথবা বহুদিন বাদে বাদে ভূমিকম্প হয়, উভয় ক্ষেত্রেই ঠিক কখন ভূমিকম্প হবে তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা এখনও বিজ্ঞানীদের সাধ্যের বাইরে। অথচ মানুষের জীবন রক্ষার্থে, ভূমিকম্পের সময়টা জানা খুব দরকার।

ভূমিকম্পের আগে বা পরে কত-গুলো পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন বা লক্ষণগুলোকে ভবিষ্যতের বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত (প্রিমনিটরিং ফেনোমেনা) বলে মনে করা হয়। ভূস্তরে চাপের সৃষ্টি হলে কোন ফাটল সংলগ্ন ভূস্তরের দুই খণ্ড যদি সরে যেতে না পারে তাহলে এই চাপ বিপুল শক্তির আকারে পাথরের মধ্যে জমতে থাকে। যে মুহূর্তে এরা সরে যেতে পারে, জমে থাকা শক্তি মুক্তি পায়— সৃষ্টি করে তীব্র কম্পনের। ভূমিকম্পে নির্গত হওয়া শক্তির একটু উদাহরণ দিই। রিক্টার স্কেলে 1·0 তীব্রতার ভূমিকম্পের সাথে তুলনা চলে যেন 2 টন ওজনের একটা ট্রাক 120 কিমি/ঘণ্টা গতিবেগ নিয়ে কোথাও আছড়ে পড়ল। রিক্টার স্কেলে 4·0 তীব্রতার ভূমিকম্পে নির্গত শক্তি 1000 টন বিস্ফোরকের শক্তির সঙ্গে তুলনীয়। সে যাই হোক, মূল কথাটা হল যে বড় ভূমিকম্প মানে বেশিদিন ধরে সঞ্চিত হতে থাকা চাপ এবং তার মানে ধরা যাক 7·5 তীব্রতার একটি দুর্ঘটনা। এ ক্ষেত্রে ভূমিকম্প ঘটার 5, 10 বা 15 বছর আগে এক এক সময় লক্ষণগুলো দেখা যাবে। ছোট ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলো দেখা যাবে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন আগে থেকে। মুশকিল হল বড় ভূমিকম্পই বেশী ক্ষতিকর এবং সেক্ষেত্রে পূর্বলক্ষণ-গুলো দেখে বড় জোর বলা যেতে পারে আগামী পাঁচ বছরে এই অঞ্চলে একটা বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ খুব নির্দিষ্ট করে দিনক্ষণ বলা যাচ্ছে না।

এবার লক্ষণগুলোর কথায় আসি। প্রথমত দেখা গেছে যে প্রতিটি ভূমি-কম্পের সাথে জড়িত থাকে অন্ততঃ চার ধরণের ভূকম্পন তরঙ্গ। দেখা গেছে বড় ভূমিকম্প হবার কিছুদিন আগে থেকে যে সব ছোটখাট ভূমিকম্প হচ্ছে তার থেকে নির্গত কোন কোন ভূকম্পন তরঙ্গের বেগ কমে যেতে থাকে। ভূমিকম্প হবার ঠিক আগে আগে তরঙ্গের বেগ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ কোন ভূকম্পন প্রবণ অঞ্চলে ছোটখাট কম্পন প্রায়ই হয়। দেখা গেছে বহু ক্ষেত্রে বড় বড় ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট ভূমি-কম্পের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যায় এবং ভূমিকম্পের ঠিক আগে ছোট কম্পনের সংখ্যা কমে যায় (লাটুরে এরকম ঘটেছিল)।

তৃতীয়তঃ বড় ভূমিকম্পের বেশ কিছুদিন আগে থাকতে ভূস্তর বেঁকে যাওয়ায় মাটি হেলে পড়তে (টিল্টিং অফ দ্য গ্রাউণ্ড) থাকে। ভূমিকম্পের ঠিক আগে এই হেলে পড়ার মাত্রা কমতে থাকে। চতুর্থতঃ যে অঞ্চলে ভূমিকম্প ঘটতে পারে দেখা গেছে সেখানকার গভীর কুয়ো বা নলকূপগুলোর জলে র‍্যাডন নামে একটি গ্যাসের মাত্রা বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রেও ভূমিকম্পের ঠিক আগে আগে নির্গত র‍্যাডনের মাত্রা কমতে থাকে। পঞ্চমতঃ ভূমিকম্পের আগে সংশ্লিষ্ট পাথরগুলোর বৈদ্যুতিক গুণাবলীতে (ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্‌টিভিটি) কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। ষষ্ঠতঃ পশু-পাখী ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে ভূমিকম্পের আগে কিছু অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। মূলত চীনা বৈজ্ঞানিকরা প্রাণীর আচরণ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে দাবী

করেছেন। উপরের ছটি লক্ষণের ক্ষেত্রেই বলা যায় যে তাদের উপস্থিতির সাথে সম্ভাব্য বড় ভূমিকম্পের কোন সরাসরি যোগাযোগ আজও বৈজ্ঞানিকরা বের করতে পারেন নি। অর্থাৎ ভূকম্পন তরঙ্গের বেগ কতটা কমলে অথবা কতটা র‍্যাডন গ্যাস নির্গত হলে, কত দিনের মধ্যে ভূমিকম্পে হবে তার কোন সঠিক হিসাব এখনও জানা নেই।

ভারতের সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা, যার মধ্যে মধ্যে আছে অনেকগুলো গভীর ফাটল বা 'থ্রাস্ট ফল্ট'। ভারতীয় প্লেট চীনা প্লেটের দিকে ক্রমাগত সরে যাবার ফলে ভূস্তরে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলস্বরূপ এই সব ফাটল বরাবর মাঝে মাঝে সরে যায় ভূস্তর ও সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। আসাম থেকে কাশ্মীর উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর কোন অঞ্চলে যদি দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে ছোট বা মাঝারী আকারের কোন ভূমিকম্প হচ্ছে না, তাহলে সন্দেহ করার কারণ আছে যে সেখানে প্রবল চাপ সঞ্চিত হচ্ছে এবং একটা বড় ভূমিকম্প এখানে হতে পারে। হিমাচল প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলকে এই পদ্ধতিতে বিপদের সম্ভাবনাময় অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধরনের অঞ্চলে যদি এবার খুব খুঁটিয়ে পূর্বাভাষের ছটি লক্ষণকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে আরও খানিকটা আভাষ পাওয়া সম্ভব ভবিষ্যত ভূমিকম্প সম্পর্কে—যদিও এ সত্ত্বেও ভূমিকম্পের সঠিক সময়টা বলা সম্ভব না হতেই পারে।

লাটুরের ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও কিছু পূর্বাভাষ ছিল, বিশেষতঃ একটা বড় সময় জুড়ে ছোট ছোট অসংখ্য কম্পন হয়েছে এ অঞ্চলে। 1984 অথবা 1992 সালের এই ভূকম্পনের পরেও যদি ভূবৈজ্ঞানিকরা তীক্ষ্ন নজর রাখতেন এই অঞ্চলের ওপর, তাহলে হয়ত আগাম লক্ষণগুলোর আরও অনেকগুলোই পাওয়া যেত এখানে। সেক্ষেত্রে '93-র সেপ্টেম্বরে আকাশ ভেঙে পড়ার অনুভূতি হত না বৈজ্ঞানিকদের, জনসাধারণ ও প্রশাসনকে সজাগ করার সম্ভাবনা থাকত অনেক বেশি।

একটু বলে রাখা ভাল নানা অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও 6-7টি খুব বড় ধরনের ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকরা উপরোক্ত লক্ষণগুলোর সাহায্যে সঠিক পূর্বাভাষ করতে পেরেছেন। 1978 সালের নভেম্বর মাসে মেক্সিকোর ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ ছিল, যা স্থানীয় প্রশাসন উপেক্ষা করে। 7·9 তীব্রতার এই ভূমিকম্পে বিপুল ক্ষতি হয়। আর চীনের হাইচেং অঞ্চলে ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা আগে দেওয়া পূর্বাভাষের ভিত্তিতে প্রশাসনিক তৎপরতায় বহু মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। □

চাষের জমিতে বি এস এফ হানা

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ

চারপাশে যা দেখেছি ঃ এক

উত্তর চব্বিশ পরগণার একটি ছোট্ট মফস্বল শহর অশোকনগর। কলকাতা থেকে বনগাঁ লাইনে 40 কিলোমিটার। চারধারে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম দিয়ে ঘেরা, গাছ-গাছালিতে ভরপুর মূলতঃ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অশোকনগর গড়ে উঠেছে বিগত 40/45 বছর ধরে। অনেক ঝড়-ঝাপটা ও জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিল তিল করে যে উপনগরী গড়ে উঠেছে—তার অস্তিত্ব এখন বিপন্ন। কেন বিপন্ন তা বুঝতে হলে আপনাকে কিছুটা জানতে হবে আর আসতে হবে অশোকনগরে। এই কারণেই এই প্রতিবেদন।

অশোকনগর স্টেশনের পাশে জাতীয় সড়ক যশোর রোড থেকে যে রাস্তাটা অশোকনগরের ভিতরে ঢুকেছে তা দিয়ে এক কিমি এলেই আট নম্বর কালিবাড়ী মোড় থেকে শুরু হয়েছে নৈহাটি রোড। এই রাস্তা ধরে আরও এক কিমি চলে আসুন। ডানদিকে অশোকনগর তিন নম্বর স্কীম, জনকল্যাণ পল্লী, মোমিনপুর ও হিজলী গ্রাম আর বাঁ দিকে বাইগাছি ও শ্রমলক্ষী গ্রাম। এই গ্রামগুলোর সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে অধুনা মজে যাওয়া একসময়ের বেগবতী বিদ্যাধরী খাল। গ্রামগুলোর মাঝে রয়েছে বিস্তীর্ণ চাষের জমি। উন্নত মানের ধান ও পাট ছাড়াও বিভিন্ন তরকারি ও শস্য উৎপাদিত হয় এই সব জমিতে। আশপাশের কয়েক হাজার গ্রামবাসী-দের জীবন ও জীবিকার সাথে যুক্ত এই চাষের জমি। মূলতঃ সাঁওতাল অধ্যুষিত আদিবাসী গ্রাম সরদারপাড়ার বেশ কিছু ভূমিহীন কৃষক এই চাষের জমিতেই জনমজুর হিসেবে কাজ করেন।

খেলাটা শুরু হয়েছে গত এক/দেড় বছর ধরে। চাষের জমিগুলো পড়েছে প্রমোটারের নেক নজরে। প্রমোটাররা জমি নিয়ে কি করবে? তারা বি এস এফ-কে জমি বেচে দেবে। বি এস এফ জমি নিয়ে কি করবে? তারা ক্যাম্প তৈরী করবে, তৈরী হবে ট্রেনিং সেন্টার, চাঁদমারী ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় 300 বিঘে চাষের জমিতে তৈরী হবে বি এস এফ ক্যাম্প এবং রাস্তা-ঘাট তৈরীর প্রয়োজনে ধ্বংস হবে আরও 200 বিঘে জমি। ব্যস, শুরু হল দালালি, ফাটকাবাজী। যে জমির স্বাভাবিক বাজার মূল্য 20 হাজার টাকা সেই জমির দাম বিঘে প্রতি আশি হাজার দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতিতে বেশ কিছু জমি বায়নাও করে ফেললো কলকাতার কিছু প্রমোটারের স্থানীয় এজেন্টরা। সরল সহজ অনেক গ্রাম-বাসী সাদা কাগজে সই করে কিছু টাকা নিয়ে প্রতারকের ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন। অবশ্য অশোকনগরের কিছু মধ্য-উচ্চবিত্ত মানুষের জমিও প্রস্তাবিত এলাকায় রয়েছে। তারা সুযোগ পেয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারার তাগিদে বেশ কিছু জমি বেচে দিল।

প্রথম প্রতিবাদ করেন হিজলী-মোমিনপুরের গ্রামবাসীরা। তাঁরা স্থানীয় দালালদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেন এবং বি এস এফ যখন জমি পরিদর্শনে আসে তখন দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানান। ফলে কার্যত বি এস এফ তখনকার মত পালিয়ে যায়। এর পরই 10 আগষ্ট 1993 অশোকনগরে তৈরী হয়—বি এস এফ ক্যাম্প প্রতিরোধ কমিটি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষাব্রতী, কৃষক, শ্রমিক, সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমন্বয়ে প্রতিরোধ কমিটি একটি সর্বদলীয় অরাজনৈতিক প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরী করে। প্রাক্তন এম এল এ, স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত ও পৌরসভা সদস্য থেকে শুরু করে বহু সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ কমিটিতে আসেন। শুরু হয় বিভিন্ন এলাকায় পথসভা, এম এল এ থেকে শুরু করে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী অবধি ডেপুটেশন, গণস্বাক্ষর অভিযান। থমকে যায় দালাল ও বি এস এফের অপচেষ্টা। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। একদিকে যেমন এই অঞ্চলের মানুষরা প্রতিরোধ কমিটির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হয়েছেন দলমত নির্বিশেষে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করছেন যে যার সাধ্যমত, তেমনি অন্যদিকে প্রশাসনের একটি মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলোর অনেকেই এই ইস্যুতে দোদুল্যমান ও দ্বিধাবিভক্ত। অনেকেই মনে করছেন এখানে বি এস এফ ক্যাম্প হলে স্থানীয় এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, বেকাররা কিছু কাজ পাবে। প্রচারটা নেহাতই ভ্রান্ত ও হয়তো বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত—এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এই পটভূমিকায় বি এস এফ ক্যাম্প বিরোধী আন্দোলন চলছে। গত দু বছরে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বি এস এফ যে অন্যায় ও অত্যাচার করে চলেছে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে তার প্রতিবাদ করছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও। ফলে অশোকনগরে প্রস্তাবিত বি এস এফ ক্যাম্প বিরোধী প্রচার নতুন মাত্রাও পাচ্ছে। আমরা মূলতঃ যে কারণে প্রস্তাবিত বি এস এফ ক্যাম্প বিরোধী তা হল ঃ

এক) প্রস্তাবিত বি এস এফ ক্যাম্প প্রায় 300 বিঘে চাষের জমিতে হবে। চাষের জমির সংকট যখন ক্রমবর্ধমান তখন এইভাবে চাষের জমিকে অন্য জমিতে রূপান্তর বেআইনী, অনৈতিক।

দুই) প্রস্তাবিত এলাকায় কিছু 'খাস জমি' আছে। 'খাস জমি' কেবলমাত্র ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য প্রচলিত আইন আছে। সেখানে বি এস এফ কে 'খাস জমি' দেওয়া হবে কেন?

তিন) প্রস্তাবিত জমিতে চাষ আবাদের মাধ্যমে আশপাশের গ্রামের বেশ কয়েক হাজার মানুষ জীবন ধারণ করেন। তাদের জীবন ও জীবিকা বিঘ্নিত হবে।

চার) অশোকনগর পৌরসভা অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। সেই পৌর এলাকার মধ্যে এই ধরণের প্রস্তাবিত বৃহৎ ক্যাম্প সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা তৈরী করবে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে। কল্যানী, শিকারপুর বাদু এবং সম্প্রতি ইসলামপুরের মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্য প্রমাণিত।

পাঁচ) বি এস এফ ক্যাম্প সীমান্তেই হওয়া উচিৎ। এই অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত 50 কিমি থেকেও বেশী দূরে। সেই সীমান্তও এমন কিছু উত্তেজনাপূর্ণ নয় যে কারণে নতুন করে 100 কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বি এস এফ ক্যাম্প তৈরী করতে হবে—বিশেষ করে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে।

অবশেষে, আপাততঃ যা বলবার তা হল, আমরা আমাদের সাধ্যমত লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছি। জমি-প্রমোটার-প্রশাসন-বি এস এফ চক্রের সাথে লড়তে হলে তা হবে দীর্ঘস্থায়ী

লড়াই—এটা আমরা জানি। এটা কোনও দলীয় রাজনৈতিক লড়াই নয়। সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে বাঁচার তাগিদে একটা কমিউনিটির লড়াই বলা যেতে পারে এই আন্দোলনকে। আমরা চাই তথ্যর আদান-প্রদান, আরও প্রচার—বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে! আসুন এবং যোগাযোগ করুন।

সুবোধ দাস ও শক্তি ভট্টাচার্য
যুগ্ম আহ্বায়ক
বি এস এফ ক্যাম্প প্রতিরোধ কমিটি,
অশোকনগর
153/1/3, অশোকনগর
উত্তর চব্বিশ পরগণা,
পিন-743222

আলকাতরা দূষণ থেকে আমাদের বাঁচান

একটি আর্তি

চারপাশে যা দেখেছি ঃ দুই

আমরা হাওড়া জেলার ডোমজুর থানার বিপ্রন্নপাড়া মৌজার বিপ্রন্নপাড়া ও জঙ্গলপুর এলাকার মানুষরা এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছিলাম। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে অন্যান্য কিছু ছোট ছোট কারখানার সাথে বিশেষভাবে তিনটি আলকাতরা তৈরীর কারখানা আমাদের এলাকার পরিবেশকে বিপন্ন ও বিষাক্ত করে তুলেছে। একটি কারখানার নাম লীডিং এজ টার ম্যাক্স (প্রা) লিমিটেড, দ্বিতীয়টি গ্যালাক্সি টার কেমিক্যাল প্রোডাক্টস (প্রা) লিমিটেড এবং তৃতীয় কারখানায় আগে চটের সামগ্রী তৈরী হত; বর্তমানে এই কারখানাতেও আলকাতরা তৈরী হয়। কিন্তু কারখানার গেটে কোনও 'নেম প্লেট' নেই। এইসব কারখানা-গুলো 6 নং জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত। যে জায়গায় এগুলো তৈরী হয়েছে সেগুলো আগে ধানচাষের জমি ছিল। মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে মিঃ জালান নামে এক দালাল ঐ সব জমি কিনে নিয়েছে ও নিচ্ছে। জমি-গুলোকে এমনভাবে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে যে জলনিকাশীর কোনও ভালো ব্যবস্থা থাকছে না। এই ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। যখন কোনও কারখানার মালিক পঞ্চায়েত দপ্তরে অনুমতির জন্য আসে তখন তারা পঞ্চায়েতকে জানায় না যে তারা সঠিক কি জিনিষ তৈরী করবে। পঞ্চায়েত যে সার্টিফিকেট দেয় তাতে পরিষ্কার বলা থাকে, এমন জিনিস তৈরী করবেন না যাতে পরিবেশ ও এলাকার মানুষের ক্ষতি হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় কিছু মালিক আলকাতরার কারখানা তৈরী করেছে এবং পরিবেশ দপ্তর থেকে ছাড়পত্রও নিয়ে এসেছে। তারা পরিবেশ দপ্তরকে জানিয়েছে, 'আমরা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি।' বাস্তবে তারা কোনও কিছুই করেনি।

উপরোক্ত তিনটি কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস এবং বর্জ্যপদার্থ নিম্নলিখিত ক্ষতি করছে বলে আমরা মনে করছি ঃ—

(1) গ্যাসের প্রকোপে এলাকার মানুষের বমি বমি ভাব তৈরী হচ্ছে, পেটের গণ্ডগোল হচ্ছে।

(2) দুর্গন্ধের দাপটে বাড়িতে থাকা যাচ্ছে না।

(3) কারখানায় কোনও নিকাশী

ব্যবস্থা না থাকায় বিশেষভাবে বর্ষা কালে এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায় এবং পানীয়জলও বিষাক্ত হয়।

এছাড়া আলকাতরার কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ ও ধোঁয়া মানুষের শরীরে কি কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী করে তা নিয়ে সঠিকভাবে না জানায়, চরম ভয় ও বিপন্নতার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছি। কারখানার কর্তৃপক্ষকে এই দূষণ সংক্রান্ত সমস্যা আমরা বহুবার জানিয়েছি, স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং থানাও এই ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানে। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লীডিং এজ টার ম্যাক্স-এর মালিককে দূষণ প্রতিরোধের জন্য আমাদের গ্রামের বারোয়ারীতলা স্কুল প্রাঙ্গনে এক সভায় ডাকা হয়েছিল। সেখানে গ্রামের সমস্ত মানুষ এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মালিক ঐ সভাতে হাজির হননি। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর বহু মানুষ ঐ কারখানার সামনে সমবেত হন। কিন্তু কারখানার মালিককে সেখানেও না পেয়ে উত্তেজিত জনতা কিছুটা ভাঙচুর করে। ওদিকে মালিক স্থানীয় ডোমজুর থানাকে জানান যে আমরা নাকি কারখানা লুঠ করতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার মালিকের সঙ্গে আলোচনার জন্য বলা হয় এবং মালিক রাজী হয়ে যান। কিন্তু মালিকের মনে কু-মতলব ছিল। নির্দিষ্ট দিনে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং বেশ কিছু লোক কারখানার সামনে উপস্থিত হতেই পুলিশ তাদের লাঠি চার্জ করে এবং বলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে না গেলে গুলি চালানো হবে। পরে অবশ্য থানার ও সি গ্রামবাসীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। কারখানার মালিক নাকি তাকে বলেছিলেন গ্রামবাসীরা কারখানা লুট করতে আসবে। এই ঘটনাটি ঘটেছিল গত মার্চ—এপ্রিলের মধ্যে। তারপর থেকে আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ বছর নতুন উদ্যোগে আমরা আন্দোলনের জন্য তৈরী হয়েছি। গণস্বাক্ষর অভিযান চলছে গ্রামে গ্রামে। মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী থেকে স্থানীয় এম এল এ সব জায়গাতেই আমরা ডেপুটেশন দেব।

বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে যখন বিস্তর ভাবনা-চিন্তা হচ্ছে, আমাদের দেশে সর্বোচ্চ আদালত পরিবেশ দূষণের দায়ে যখন বেশ কিছু বড় বড় কারখানা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে বা দিচ্ছে, তখন আমরা আলকাতরার আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছি। জানিনা আমাদের শিশুদের ভবিষ্যত কি?

আমাদের দাবী—হয় কারখানাগুলো পর্যাপ্ত দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা নিক, নয়তো জনবসতি এলাকা ছেড়ে ওগুলো ফাঁকা জায়গায় চলে যাক।

বিপ্রন্নপাড়া গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে
অলোক চ্যাটার্জী
গ্রাম ও পোঃ—বিপ্রন্নপাড়া,
জেলা—হাওড়া, পিন—711411

বন্ধ ও রুগ্ন কল-কারখানা সংক্রান্ত পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন—

নাগরিক মঞ্চ

134, রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড।

রুম নং—7 ব্লক-বি।

কলিকাতা—700085

নরপ্ল্যাণ্ট আসছে, একটু ভাবুন

জন্মনিয়ন্ত্রণের রাজনীতি ও আমরা মেয়েরা

লোক গিস্‌গিস্‌ করা বাসস্ট্যাণ্ড বা স্টেশন থেকে আপনি হয়তো কোন রকমে ধাক্কাধাক্কি করে একটা বাসে বা লোকাল ট্রেনের কামরায় ওঠার চেষ্টা করছেন। হয়তো তখনি আপনার চোখে পড়ল মাথায় নোংরা চুলের জটা, গায়ে খড়ি উঠছে, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা এক মা, তার গোটা পাঁচেক বাচ্চার এক দঙ্গল নিয়ে আপনারই মত ঠেলাঠেলি করছে ভেতরে ঢোকার জন্য। বিরক্তিতে ভুরুটা আপনার কুঁচকে উঠল—'উঃ, কতগুলো বাচ্চা! বাপরে!' কিম্বা ট্রেনের বা বাসের জানলা দিয়ে পথের পাশে যদি কখনো আপনি দেখেন ভাঙাচোরা তোবড়ানো গেরস্থালীর কয়েকটা জিনিস, তারই পাশে নোংরা ত্যানায় শোয়ানো একটা সবে হওয়া বাচ্চা, আর এপাশে ওপাশে আবর্জনার মধ্যে খেলছে আরো গোটা দু-তিন পোঁটা ঝরানো বাচ্চা—সত্যিই কি মনে হয় না 'এই যে হাজারে হাজারে পিল পিল করে বাড়ছে এই সব গরিব লোকেরা, এদের বাচ্চা হওয়া যদি বন্ধ না করা যায় তবে কি করেই বা দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে? কি করে এত জনসংখ্যার চাপ সামলাবে আমাদের সরকার? বিজ্ঞানীরা যদি কোন একটা ওষুধ বা ইনজেকশন আবিষ্কার করতো! ধরে ধরে একবার দিয়ে দিলেই পাঁচ সাত বছরের জন্য পয়দা বন্ধ হতো। তবে হয়তো এ পোড়া দেশের কোন গতি হলেও হতে পারতো।'

জেনে আনন্দ পাবেন, ঠিক আপনার পথেই এগোচ্ছেন আমাদের 'দেশপ্রেমিক' সরকার আর এতে মদত দিচ্ছেন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী আর ধনীদেশের বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা বা ফাউণ্ডেশন। একবার দিয়ে দিলে অনেক দিনের মত বাচ্চা হওয়া বন্ধ এরকম ইনজেকশন ভারতে আগেই এসেছে। এবারে একবার প্রয়োগ করে পাঁচ সাত বছর ফল পাওয়া যাবে এরকম হরমোন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাজারেও হয়তো অচিরেই তা উদয় হবে এদেশের মহিলাদের প্রতি ভারত সরকারের নবতম উপহার হিসেবে। এই হরমোনটির নাম 'নরপ্ল্যাণ্ট'।

নরপ্ল্যাণ্ট জিনিসটা কিরকম তা বলার আগে একটু পিছিয়ে গিয়ে জন্ম নিরোধক হরমোন-এর ইতিহাসটা শুরু করি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, কোন জননে সক্ষম মহিলার ওভারি বা ডিম্বাশয়ে প্রতি মাসে একটি করে ডিম্বাণু বা স্ত্রীবীজ পরিপুষ্ট হয়। অনুকূল পরিবেশে পুরুষবীজ বা শুক্রাণুর সঙ্গে এটি ডিম্বনালীর মধ্যে মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে যে অতি ছোট ভ্রূণের জন্ম হয় তা ডিম্ব-নালী বেয়ে জরায়ুর মধ্যে আসে ও সেখানেই বাড়তে থাকে। এ ভাবেই মানব শিশু জন্মায়। প্রতি মাসিক চক্রে গোটা প্রক্রিয়াটা নিয়ন্ত্রণ করে ডিম্বাশয় থেকে তৈরী হওয়া দুটি

রসায়ন বা হরমোন। একটি ইস্ট্রোজেন ও অন্যটি প্রজেস্টেরোন।

তিরিশের দশকে প্রথম ইস্ট্রোজেন আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই এই দুটি হরমোন নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। দেখা গেল যে, শরীরে অনেক প্রক্রিয়াকে কমানো-বাড়ানো ছাড়াও কৃত্রিমভাবে তৈরী ইস্ট্রোজেন বা প্রজেস্টেরোন বিশেষ ভাবে প্রতি মাসিক চক্রের প্রথম 21 দিন নিয়মিত খাওয়ালে কোন মহিলার ডিম্বাণু পুষ্ট হওয়াকে আটকানো যেতে পারে। এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, তার কারণ মানুষ এই প্রথম ভালভাবে প্রজননের রহস্য জানতে পারল এবং নিশ্চিত ভাবে তাকে নিজের দখলে রাখার উপায় বার করল।

পঞ্চাশের দশকে আমেরিকার নারী বাদীরা এই কৃত্রিম গর্ভ নিরোধক বড়ি তৈরী এবং বাজারে আসার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান। তাঁরা ভেবে-ছিলেন নারী স্বাধীনতার এ এক অন্যতম পদক্ষেপ। এই প্রথম মেয়েরা অবাঞ্ছিত সন্তানের দায় এড়ানোর হাতিয়ার পেলেন।

অন্যান্য সব বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মত গর্ভ নিরোধক হরমোনও হয়ে উঠল বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর পণ্য মাত্র। এই ওষুধ কোম্পানীগুলি নিত্যনতুন গর্ভ নিরোধক হরমোন বড়ি নিয়ে গবেষণা এবং বাজার পাবার চেষ্টা করতে থাকে। প্রধানত আমেরিকা সরকারের উদ্যোগে, বরং বলা ভাল বহুজাতিক সংস্থা ও তাদের পেয়ারের কিছু লোকের স্বার্থেই তখন দেশে দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণের হাওয়া ওঠে।

প্রচারের নতুন নতুন কায়দায় এবং চাপ তৈরী করে এরা বিভিন্ন দেশের সরকারী নীতিকেও প্রভাবিত করার হিম্মত রাখে। '60-এর দশক থেকেই মার্কিন সরকারের এবং অন্যান্য সাহায্য দানকারী সংস্থার সহায়তায় তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহিলাদের মধ্যে এগুলি বিতরণ করা শুরু হয়।

আরো গবেষণা চলতে থাকে যাতে একবার প্রয়োগ করে আরো দীর্ঘস্থায়ী ফল পাওয়া যায় এরকম হরমোন-এর জন্যে। '70-এর দশকে, আপজন কোম্পানী তৈরী করে 'ডিপো প্রভেরা' ও শেরিং তৈরী করে 'নেট এন'। এই দুটিই কৃত্রিমভাবে তৈরী প্রজেস্টে-রোন। এগুলি একবার ইনজেকশন দিলে তিন থেকে ছ মাস পর্যন্ত কোন মহিলার জন্ম দেবার ক্ষমতা বন্ধ করে দেওয়া যায়। মানুষের ইতিহাসে গর্ভ নিরোধকই একমাত্র 'ওষুধ' যা কোন রোগ সারাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, প্রয়োগ করা হয় যেকোন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

প্রাণী দেহে হরমোন দুটি ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম এটা জানা সত্ত্বেও এই দুটো হরমোন ইনজেকশন নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের গরিব মেয়েদের ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। 'ডিপো প্রভেরা' বাজারে আসে প্রায় আশিটা দেশে এবং প্রায় কুড়ি বছর ধরে এর প্রয়োগ চলে। নানা ক্ষতিকর প্রভাবের জন্যে পরে তা তুলে নেওয়া হয়।

'নেট এন' প্রথম বাজারে আসে 1967 সালে। প্রাণীদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে দেখার পরে 1971 সালে তা তুলে নেওয়া হয়। পরে ধরে নেওয়া হয়, এগুলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এবং আবার 35টি দেশের বাজারে চালু হয় 'নরিজেস্ট' নাম দিয়ে। আশির দশকের গোড়ায় আই সি এম আর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 'নেট এন' নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। গরিব মেয়েদের শরীরের ওপরে এই ক্ষতিকর ইনজেকশন দিয়ে পরীক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হায়দ্রা-বাদ, দিল্লী ও বম্বের মহিলা সংগঠন এবং মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কল-এর সংগঠনগুলি। কিন্তু সরকার এই প্রতিবাদে কান না দিয়ে তাঁদের গবেষণা চালাতেই থাকেন। অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে তবেই এই পরীক্ষা বন্ধ করা যায়।

নরপ্ল্যান্ট কি

আমেরিকার পপুলেশন কাউন্সিল-এর উদ্ভাবিত 'নরপ্ল্যান্ট' এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালানো হচ্ছে। এটিও

একটি কৃত্রিম ভাবে তৈরী প্রজেস্টেরোন হরমোন। ছয়টি দেশলাই কাঠির আকারের লম্বাটে ক্যাপসুলের মধ্যে ভরা থাকে, দাম মাত্র 1800 টাকা। বাহুর চামড়া চিরে তার নীচে এগুলিকে বসিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচ বছর ধরে এগুলি থেকে খুব অল্প অল্প করে হরমোন রক্তের সঙ্গে মিশবে এবং ডিম্বাণু তৈরী হওয়াকে বন্ধ রাখবে। পাঁচ বছর পরে এর ক্ষমতা শেষ হয়ে হয়ে গেলে আবার চামড়া কেটে বের করে ফেলতে হবে।

আমেরিকা সরকারের চাপে এদেশে ভারত সরকার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্যে নরপ্ল্যাণ্টকে ঢোকাবার চেষ্টা করে। মহিলা সংগঠন গুলির প্রতিবাদে আই সি এম আর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে, তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এটি ভারতে চালু করা হবে না।

সেই মত 1993-এর জুলাই মাস থেকে ভারতের 10টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 1000 জন মহিলার উপরে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

নরপ্ল্যান্টের তাবিজ—
গরিবী হটানোর মাদুলি

শিগগীরই আমাদের দেশে সেই দিন আসছে যেদিন পোস্টারে, হোর্ডিংএ টিভিতে কনডোম আর মালা-ডি কে ছাপিয়ে উঠবে নরপ্ল্যান্ট-এর বিজ্ঞাপন, হয়তো দেখা যাবে 'নবদম্পতি কিংবা সদ্য বাবা-মা হওয়া কোন দম্পতিকে কোন দিদিমা হাসিমুখে, কিংবা গ্রামের মোড়ল কানে কানে বলছে, কেমন করে পাঁচ বছরের জন্য বাচ্চা হবার যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিলবে—কেমন করে জন্ম নিরোধ করলেই সোনার সংসারের চাবিকাঠি এসে পড়বে হাতের মুঠোয়।'

এই আশংকাতেই আজ ভারতের বিভিন্ন কোণায় মহিলা সংগঠন ও সমাজ সচেতন সংগঠনগুলি একযোগে মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন যাতে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনি বন্ধ করা হয় আর ভারতে যেন এটি কোন মতেই চালানো না হয়।

আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে রেগে যাচ্ছেন, এই যে রোজ রোজ বড়ি গিলতে হবে না, একবার নিয়ে নিলে পাঁচ বছরের জন্য মা হবার জ্বালা থেকে রেহাই পাবে মেয়েরা, এজন্য ভারত সরকারকে কোথায় ধন্যবাদ দেবেন তা নয়, নারী সংগঠনগুলো অযথা হৈচৈ করছেন। আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা? এ তো বিজ্ঞানী আর ডাক্তারদের ব্যাপার, এ নিয়ে আপনার আমার মত এলে-বেলে লোকেদের কী বলার আছে?

তাহলে একবার, যাঁরা নরপ্ল্যাণ্ট নিয়ে আপত্তি করছেন তাঁদের কথাটা শোনা যাক ঃ

আপত্তি—১
চামড়ার নীচে শত্তুর

বাইরে থেকে তৈরী প্রজেস্টেরোন হরমোন যদি সব সময়ে শরীরে উপস্থিত থাকে তবে স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় নানা প্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী ও জরায়ুর স্বাভাবিক কার্যক্রম বিপর্যস্ত হবে। ফলে যা যা ঘটতে পারে তা হল ঃ—

1) নরপ্ল্যাণ্ট নেবার পরে ঋতু অনিয়মিত, একটানা চলতে পারে। খুব বেশী রক্তপাত হতে পারে বহুদিন ধরে, অথবা একেবারে বন্ধ হয়েও যেতে পারে। দুটি ঋতুকালের মাঝামাঝি সময়ে অল্প অল্প রক্ত পড়তে পারে। আই সি এম আর-এর বিজ্ঞানীরা অবশ্য এটাকে খুব বেশী গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের মতে—একটু আধটু ঋতুর গোলমাল হতে পারে, তবে এতে তো আর কেউ মরে যাচ্ছে না'—হ্যাঁ, মরে কেউ যাচ্ছে না হয়তো এজন্যে, কিন্তু আমাদের দেশের গরিব মেয়েরা তো এমনিতেই রক্তশূণ্যতায় ভোগেন, তাঁদের স্বাস্থ্যের উপরে এই সামান্য বেশী রক্তপাতও মারাত্মক আঘাত হানতে পারে। আর আমাদের দেশে ঋতুকালকে অশুচি বলে মানা হয়, সুতরাং এই অযথা অকারণ রক্তপাত মহিলাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তো রীতিমত উৎপাত। [বম্বের মহিলা সংগঠন এফ ডব্লিউ এইচ-এর তরফে আমাদের বান্ধবীরা দিল্লী ও বরোদায় যে মেয়েদের ওপরে পরীক্ষা হয়েছে তাদের সাথে কথা বলে দেখেছেন যে, বেশীর

ভাগ মেয়েই দু-আড়াই বছর পরে ওটি বের করে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন প্রধানতঃ অনিয়মিত ঋতুর জন্য।]

2) ডিম্বাশয়ে ফোঁড়া বা সিস্ট হতে পারে যার একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন।

3) গর্ভ নিরোধ যে পাঁচ বছর নিশ্চিত হবেই এর কোন গ্যারান্টি এখনো বিজ্ঞানীরা দিতে পারছেন না। যদি নেবার পরেও গর্ভসঞ্চার হয়, তবে নরপ্ল্যান্ট এর প্রভাবে গর্ভস্থ শিশুর জনন অঙ্গের মারাত্মক পরিবর্তন হতে পারে—যার কোন চিকিৎসা নেই।

এ ছাড়া প্রজেস্টেরোন হরমোন যেহেতু ডিম্বনালীর নড়াচড়া কমিয়ে দেয়, অতএব গর্ভসঞ্চার হলে ভ্রূন ডিম্বনালী থেকে জরায়ুতে আসতে পারে না। ফলে ডিম্বনালীতেই ভ্রূন আটকে থেকে যেতে পারে। সেখানেই বড় হতে হতে হঠাৎ ডিম্বনালী ফেটে গিয়ে মায়ের হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নরপ্ল্যান্ট শরীর থেকে বের করে দেবার পরেও এরকমটা ঘটতে পারে। যদি কোন মহিলা নরপ্ল্যান্ট নেবার পাঁচ বছর পরে বের না করে ফেলেন বা ভুলে যান তবে চামড়ার নীচে এই ধ্বংসের বীজ যে কোন সময় এভাবে তাঁর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

4) সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান, এমন মা নরপ্ল্যান্ট নিলে এই হরমোন দুধের সঙ্গে বাচ্চার শরীরে যাবে এবং বাচ্চার ক্ষতি করবে। মজার কথা হল এই যে, বিজ্ঞানীরা একে 'স্পেসিং মেথড' বা প্রথম সন্তান হবার পরে দ্বিতীয়টি যাতে দেরী করে হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইছেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এর পরে মায়েরা প্রথম বাচ্চাটি দুধ খাচ্ছে এরকম সময়েই নরপ্ল্যান্ট লাগিয়েই বাড়ী ফিরবেন এবং তাকে বিপদে ফেলবেন না জেনেই।

5) বলা হচ্ছে যে নরপ্ল্যান্ট শরীর থেকে বের করে দেবার পরে মহিলাটি তাঁর বাচ্চা জন্ম দেবার ক্ষমতা ফিরে পাবেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই দাবী করবার মত যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো হয়ে ওঠেনি।

6) রক্তচাপ বাড়তে পারে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা হতে পারে একটানা বহুদিন, হৃদরোগ দেখা দিতে পারে।

7) মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে।

8) পুরুষের মত গোঁফদাড়ি গজাতে পারে। টাকও গজাতে পারে।

9) প্রজেস্টেরোন যেহেতু শরীরে নুন ও জল ধরে রাখে অতএব ওজন বেড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই। এতই বেশী যে, 5 বৎসর পরে চামড়ার নীচে নরপ্ল্যান্ট ক্যাপসুলগুলি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হতে পারে। বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়া ডাক্তার ছাড়া এটি তখন বার করা যাবে না।

এছাড়াও, যে মায়েরা একবার নরপ্ল্যান্ট নিয়েছেন তাঁর সন্তানদের উপর অনেক বছর পরে তার কোন প্রভাব পড়বে না, এ কথা নিশ্চিত করে বলার সময় এখনো আসেনি। অতীতে যে মায়েরা 'ডি ই এস' নামক গর্ভ নিরোধক নিয়েছিলেন তা তাঁদের মেয়েদের শরীরে 25 বছর পরে ক্যান্সার সৃষ্টি করেছে। জানিনা এই নরপ্ল্যান্ট আগামী প্রজন্মকে কোন পথে ঠেলে দেবে।

আপত্তি—২

বাচ্চার জন্ম—জমা, না খরচ ?

আপনি হয়তো ভাবছেন, আচ্ছা, হলোই বা নরপ্ল্যান্ট নেবার পরে একটু আধটু কষ্ট—কিন্তু পদ্ধতির গুণাগুণ তো দেখতে হবে। একবার নিয়ে নিলেই পাঁচ বছর নিশ্চিন্ত। বাচ্চা হওয়াটা কি কম ল্যাঠা, আর ঘন ঘন হওয়া তো রীতিমতন যন্ত্রণা। নাঃ—এত সুন্দর একটা পদ্ধতির বিপক্ষে দাঁড়ানোটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে একবার 'জন্ম বিংফারণ'-এর তত্ত্বটাকে ঝালিয়ে দেখা যাক। সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে চান, সত্যিই কি গরিব মানুষরাও তা-ই চান ?

আপনার আমার মধ্যবিত্ত পরিবারে একটা বাচ্চা মানুষ করাই রীতিমত খরচার ব্যাপার। কিন্তু গরিবের ঘরে খুদকুঁড়ো খেয়ে, কানি পরে পাঁচটার

মধ্যে একটা মানুষ হয়ে যায়, বাপ-মায়ের অতো গায়েই লাগে না।

আমরা ভাবি, একটা কি দুটো বাচ্চা হোক, বেঁচে বর্তে থাকুক, আর চাই না ঝামেলা! কিন্তু আমাদের দেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা কি প্রত্যেক গরিব মানুষকে—তার একটা কি দুটো বাচ্চাই বেঁচে-বর্তে থাকবে—এই নিরাপত্তা দিতে পারে?

বুড়ো বয়সে কি আপনি আপনার ছেলেমেয়ে বৌমার হাত তোলা হয়ে থাকবেন? কখনো না। আপনার পি এফ, পেনসন, লাইফ ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক একাউন্ট—কত কী আছে। আর ঐ যে মেয়েটা পাঁচটা বাচ্চা নিয়ে ছুটোছুটি করছিল—এই বাচ্চাগুলোই একটু বড় হতে না হতে দুটো পয়সা এনে দেবে খেটে-খুটে। ওরাই ওর ব্যাঙ্ক একাউন্ট, আর ইন্সিওরেন্স।

তবুও, অনেক অনেক বাচ্চার ঝামেলা হয়তো গরিব মানুষরাও চান না। কিন্তু সরকারের 'এক বা দুই' অথবা এক মায়ের একটাই মেয়ে—এরকম নীতি চাপিয়ে দেওয়া কি জবরদস্তি নয়?

একটুখানি ভাবুন, যে হারুর মা আপনাদের বাড়ীতে কাজ করেন, তাঁর হয়তো বিয়ে হয়েছে তেরোয়, বাচ্চা হওয়া শুরু হয়েছে পনেরোয়, যখন আপনি ফ্রক পরে ইস্কুলে যেতেন। আজ তিরিশ বছর বয়সে সাত আটটা বাচ্চা বিইয়ে, দীর্ঘদিন আধপেটা খেয়ে আর অপরিসীম খাটুনির ক্লান্তিতে আজ সে আধবুড়ী। ওই মহিলা যদি একটু ভাল খেতে পরতে পেতেন, ইস্কুলে কলেজে আপনার মতন পড়ে শুনে চালাক চতুর হতেন, যদি উনি জানতেন বাচ্চা কেন হয়, কেমন করে হয়, যদি উনি নিজের জীবনে শিক্ষা, পেশা, চাকুরি, বিয়ে, সহবাস, বাচ্চার জন্ম হওয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মত নিজেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পেতেন তবে কি ওঁর এত-গুলো বাচ্চা হতো? সরকারকে কি তবে ওঁর গর্ভধারণ করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এত উঠে পড়ে লাগতে হতো?

আসল কথা, সামাজিক সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণ যে সরকার করতে পারে না, দেশের গরিবদের জন্য শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ন্যূনতম দায়িত্বও নিতে পারেনা; তাকে কাজে কাজেই জন্তু জানোয়ারের মতন সংখ্যা কমিয়ে মানুষের সমস্যা সমাধানের ছল করতে হয়। কিন্তু এই পথে কোনও দিন গরিবী হঠবে না।

আপত্তি—৩
তৃতীয় বিশ্বের মেয়েরা ল্যাবরেটরীর গিনিপিগ—

কথাবার্তা বলে দেখা গেছে যে মেয়েদের ওপরে নরপ্ল্যান্ট লাগানো হয়েছে তাঁরা প্রায় কেউই জানতেন না যে এই ওষুধটি নতুন, তাঁদের ওপরে প্রথম পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, বা এর কি কি ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হতে পারে, হলে কোথায় ও কিভাবে তাঁরা চিকিৎসা পাবেন। সত্যি কথা বলতে কি, অনেকগুলি ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কোন চিকিৎসা নেই। উপযুক্ত পরীক্ষা ও প্রস্তুতি ছাড়াই, এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়াই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। এতই হাল্কা চালে এই পরীক্ষার সাবজেক্ট বাছাই করা হয়েছে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নৈতিকতা অনুযায়ী 'জেনেশুনে সম্মতি' দেওয়ার নাম গন্ধও এখানে ছিল না। ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলা! নৈব নৈব চ—যদি সাবজেক্ট ভড়কে গিয়ে না নিতে চায়! একমাত্র পরামর্শ তাঁরা পেয়েছেন 'নরপ্ল্যান্ট লাগা লো—বাচ্চা নেহি হোগা।'

ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া যখন সত্যি সত্যি দেখা দিয়েছে, তখন এইসব মেয়েরা দেখেছেন তাঁদের কষ্টের প্রতি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেক ক্ষেত্রে মরীয়া হয়ে টাকা খরচ করে অন্য ডাক্তার দেখিয়ে তবে এটা বের করে ফেলতে হয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষারই যদি এই হাল হয়, তবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্যে একে নেওয়া হলে, 'লক্ষ্য-মাত্রা' পূরণের চাপে হাজার হাজার সুস্থ মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন শুধু মাত্র জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে।

আপনি হয়তো ভাবছেন, মানুষের ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করলে কি করে একটা 'ওষুধের' গুণাগুণ যাচাই হবে ? একবারও কি ভেবেছেন, দেশে কি বিদেশে সাদা চামড়ার ধনী, শিক্ষিত, সচেতন, অগ্রণী সমাজের মেয়েরা যাঁরা সত্যিকারে যাচাই করার ক্ষমতা রাখেন ও মতামত দিতে পারেন, তাঁদের কখনো কেন এ ধরণের পরীক্ষায় সামিল করা হয় না ? গরিব অশিক্ষিত মেয়েদের এভাবে গিনিপিগের মত ব্যবহার করা কি মানব অধিকার লঙ্ঘন করা নয় ?

আপত্তি—৪
তরু হতে যে বা হয় সহিষ্ণু
তৃণ হতে দীন তর···

জোর করে পুরুষের নির্বীজকরণের ফলাফল হিসেবে নির্বাচনে ভরাডুবি হবার পর থেকে সরকার সাবধান হয়েছেন। যত ধরণের নতুন গর্ভ নিরোধক বাজারে আসছে—তা সবই মেয়েদের শরীরে কাজ করে। পুরুষের শরীরে কাজ করে এরকম জন্ম নিরোধকের উপরে নতুন গবেষণাও অনেক কমে গেছে। কারণ, সরকার এটা বুঝেছেন, মূক, মূর্খ, পুরুষ-শাসিত আমাদের মেয়েরা কখনো নির্বাচনে এ নিয়ে ঝড় তোলার কথা ভাবতেও পারবেন না।

বলা হচ্ছে মেয়েরা এতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-এর অধিকার পাবেন। অন্য কারোর, যথা স্বামী বা শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মতামতের তোয়াক্কা না রেখেও তাঁরা এটা লাগাতে পারবেন। এই যুক্তি হাস্যকর, কারণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তাঁরা জানতে পারবেনই। বরং গর্ভনিরোধক বড়ি খেয়ে কোন কষ্ট হলে তা বন্ধ করে দেওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে, লুপ বা কপার টীতে কোন অসুবিধা হলে যে কোন স্বাস্থ্য কর্মীর সাহায্য নিয়ে তা বের করে ফেলা যায়, কিন্তু একবার নরপ্ল্যান্ট লাগালে হাজার কষ্ট হলেও, তাকিয়ে থাকতে হবে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের দিকে, প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসার জন্য ছুটতে হবে সেই ডাক্তারের কাছেই, নির্ভর করতে হবে বহুজাতিক কোম্পানীর ওষুধ বা ইনজেকশনের উপরে। নিজের শরীর ও জন্ম দেবার ক্ষমতাকে এভাবে অসহায়ের মত 'কর্তা'-দের হাতে তুলে দেওয়া কি 'আত্ম নিয়ন্ত্রণ' না 'আত্ম সমর্পণ' ?

গরিব মানুষের জন্ম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সরকারের যে মস্ত বড় ফাঁকি রয়েছে, আর রাক্ষুসে বহু-জাতিক ওষুধ কোম্পানী-দালাল ও নেতাদের দুষ্টচক্রের স্বার্থ আছে এটা হয়তো একটু একটু করে আপনি বুঝতে পারছেন ; আসুন তবে এই সমস্ত নারী সংগঠন গুলির সাথে গলা মিলিয়ে আমরাও বলি—

1) জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। যত ধরণের নিরাপদ পদ্ধতি আছে এবং প্রয়োজনে নিরাপদে গর্ভপাত করানোর ব্যবস্থা গরিব মানুষের হাতের কাছে রাখতে হবে যাতে তাঁরা নিজেদের সুবিধামতন পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন, রেস্তঁরায় বসে মানুষ যেমন ইচ্ছেমতন খাবার বেছে নেয়।

2) মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রামের একান্ত শেষে থাকা মেয়েটিও যাতে স্ত্রীরোগ ও অন্যান্য অসুখ নির্ণয় ও চিকিৎসা করাতে পারে সেভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে, সমস্ত উদ্যোগ কেবলমাত্র যেন তেন প্রকারে জন্ম নিয়ন্ত্রণের 'কোটা' পূরণ করার কাজে ব্যয় করা চলবে না।

3) আমাদের দেশের মেয়েদের এভাবে গিনিপিগের মত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা চলবে না।

4) নানাধরণের জরায়ু-কণ্ঠের ঢাকনি যা বিদেশে পাওয়া যায় এবং সস্তা ও নিরাপদ এবং মেয়েরা যা সহজেই ব্যবহার করতে পারেন তা ভারতে চালু করতে হবে। 'স্বাভাবিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ' পদ্ধতির উপরে গুরুত্ব এবং জনশিক্ষা দিতে হবে।

পালক নীতি ঃ একটি পত্রিকার নাম

[সম্প্রতি এক বন্ধুর মারফত পুণা শহরের এই পত্রিকা গোষ্ঠীর একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে এসেছে। সমাজে 'প্রতিযোগিতা'র আবহাওয়া আজকের শিশুমনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং কিভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় এই নিয়ে সাত বছর ধরে কাজ করছে এই গোষ্ঠী। মূল লেখাটি তৈরী করেছেন শর্মিষ্ঠা খের, এখানে এটির সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হল—সঃ মঃ, বিওবি।]

পালক নীতি'—একটি পত্রিকা তথা পত্রিকাগোষ্ঠীর নাম। খোলামেলা সংগঠন। এর সাথে যুক্ত প্রধানতঃ মধ্যবয়স্ক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিছু মানুষ যারা শুধু নিজেদের ছেলেমেয়েই নয় অন্য ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ নিয়েও ভাবনা চিন্তা করতে আগ্রহী। অবশ্যি অল্পবয়সীরাও দুচারজন আকৃষ্ট হচ্ছেন এই কাজে।

মাসিক পত্রিকা এটি। পৃষ্ঠাসংখ্যা মোটামুটি দশের মত। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পত্রিকার সাত বছর বয়সকালের মধ্যে একবারের জন্যও কামাই হয়নি প্রকাশনায়। পত্রিকায় আলোচিত বিষয়সূচির মধ্যে আছে স্কুল ও পরিবার-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে শিশুদের আচরণ স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষা, পরিবেশ সচেতনতা, প্রথাগত এবং অপ্রথাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তির উপায় ইত্যাদি। বলতে গেলে চারপাশের সব-কিছুকেই যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয় এই পত্রিকায়। যেমন শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক কারসুপির ঘটনা কিংবা বোম্বাই শহরে বোমা-বিস্ফোরণের ঘটনাও পত্রিকার পাতায় স্থান পেয়েছে। সমাজে দায়িত্বশীল পিতামাতাদের সমস্যা অনেক। এ বিষয়টি পত্রিকায় আলোচিত হয়। আবার জড়বুদ্ধি সম্পন্ন সন্তানের পিতামাতা কিংবা বিশেষ মেধাবী সন্তানের পিতামাতারাও তাদের নিজ নিজ সমস্যার বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন এই পত্রিকার পাতায়। একবার একজন মা তার ছেলের যৌনতা সম্পর্কিত আচরণ বিষয়েও লিখেছেন এই পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছে। পরামর্শ চেয়েছেন। পত্রিকাগোষ্ঠী থেকে অভিজ্ঞ লোকজন দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে—এমন ব্যবহারের স্বাভাবিকতার বিষয় জানিয়ে।

এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব মূলতঃ দুজনের ওপর ন্যস্ত। আর তাদের ঘিরে রয়েছেন বেশ কয়েকজন সহযোগী, যারা নানা ভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাজ করেন বা যোগাযোগ রাখেন। যেমন আছেন শ্রীমতি বিজয়া লাওয়াতে। ইনি কাজ করেন বারবণিতাদের সন্তানদের পিতৃ-মাতৃত্বের সমস্যা সম্পর্কে। যেমন আরেকজন হলেন—শ্রীমতি মঙ্গলা সামন্ত। ইনি স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে নারীমুক্তি বিষয়ে সঠিক ধ্যান-ধারণা প্রসারের কাজ করেন।

পত্রিকার প্রধান সম্পাদিকা ডঃ কুলকার্নীর অভিযোগ হল তাদের এই কাজে লাগাতার কাজ করার জন্য একজন পুরুষ কেউ এগিয়ে আসেননি এখনও। বেশ কিছুটা সময় এবং শ্রম দিতে পারেন এমন একজন পুরুষ কর্মীর জন্য এরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। এমনিতে পুরুষ সদস্য অনেকেই আছেন। প্রয়োজনে তারা সাহায্যও করেন।

এ পর্যন্ত লিখিত কোন সংবিধান বা আচরণবিধি ছাড়াই পত্রিকা চলে আসছে। পঞ্চাশজন শুভানুধ্যায়ী আজীবন সদস্য হয়েছেন এবং এর কাজকর্ম অটুট রাখতে পাঁচশ করে টাকা দিয়েছেন।

এই পত্রিকার সাথে যুক্ত "নীতি" শব্দটি বিশেষ অর্থবহ। এর মধ্য দিয়ে পিতামাতারা স্বেচ্ছায় যেন একটা

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন,
ব্লক এ, কলিকাতা-89, পিন-700 089

আর এন 34929/79
ষষ্ঠদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল—জুন '94

অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে তারা তাদের সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সন্তানের ঐহিক সুখ-সুবিধের দিকেই কেবল দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবেন না। তাকে ছাড়িয়েও যাতে যাওয়া যায় সে চেষ্টা করবেন।

মাঝে মধ্যে আত্মসমীক্ষা প্রয়োজন। অনেক সময় সন্দেহ হয় মহারাষ্ট্রের মত এমন আলোকপ্রাপ্ত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজ্যের মাত্র এক হাজার জন পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারাটা আদৌ গর্বের বিষয় কিনা। মহারাষ্ট্রের বাইরেও মারাঠী ভাষাভাষী কিছু পাঠকের কাছে এ পত্রিকা পৌঁছয়। তবে তার সংখ্যা এখনও অল্পই। এই কাজের মূল্যায়ন অবশ্যি গোষ্ঠীর বাইরের লোকজনই করবেন। পত্রিকা সংশ্লিষ্ট মানুষজন ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাজে সন্তুষ্ট থাকতেই পারেন। অধ্যাপক ধাবলকর সম্ভবত সঠিকভাবেই বলেন যে—একটা নতুন ভাবনা আন্দোলনের আকার নিতে একটু সময় তো নেবেই—বিশেষ করে প্রকৃত জন-আন্দোলনের রূপ পেতে। □

---

* 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' ঠিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

* লেখা পাঠান—'উন্নয়ন'কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যা ভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বি-তে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

* গ্রাহক হোন, কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

যাঁরা কাজ করেছেন—কম্পোজ □ গীতশ্রী সেন, রায়বাবু, স্বপন সেন ॥ মেক আপ □ স্বপন সেন
মেশিনম্যান □ কালীবাবু ॥ বাইণ্ডিং □ লক্ষ্মণ দাস ॥ মুদ্রক □ সমুদ্র ঘোষ।

বি ও বি-র পক্ষ থেকে—স্বাতী, বনশ্রী, নিত্যানন্দ, শেখর, সত্যব্রত, অলক, তপন, শিপ্রা।
প্রচ্ছদ □ রবীন চক্রবর্তী, অলক।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিণ্টিং পার্বলিসিটি,
117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-9 থেকে মুদ্রিত।